

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা



প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেন্দান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেন্দান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা
স্বামী মহারাজ ● সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী
মহারাজ ● সহ-সম্পাদক শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন
গোপাল দাস ● সম্পাদকীয় পরামর্শক পুরুষোত্তম
নিতাই দাস ● অনুবাদক স্বরাত মুকুন্দ দাস ও
শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● গ্রন্থ সংশোধক
সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● প্রবন্ধক
সৌমেন সরকার ● প্রচ্ছদ/ডিটিপি শ্রবণ ধারা
● হিসাব রক্ষক সুশান্ত কুমার রায় ● গ্রাহক
সহায়ক জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● সৃজনশীলতা
রঞ্জীগৌর দাস ● প্রকাশক ভক্তিবেন্দান্ত বুক ট্রাস্টের
পক্ষে সত্যদর্শী নন্দা দ্বারা প্রকাশিত ● অফিস
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট
১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩)
২২৮৯-৬২৪৭, ২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ
৮৬২১০০৭৮১৩,

মেইলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন
সমাচার (বুক পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ২০০ টাকা,
২ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা, ৩ বছরের জন্য -
৫৭০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার
(রেজিস্ট্রি পোস্ট) ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) -
৪৩০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার
(কুরিয়ার সার্ভিস) ১ বছরের জন্য - ৩৮০ টাকা
(কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৬০০
টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● মানি অর্ডার
উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা
নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার পাঠক
ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাঞ্জিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)

৭, শেঙ্কপিয়ার সরণী, কোলকাতা

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০০৩২৯৪৩৯

আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা
সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার
সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি
আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে
আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।



ভক্তিবেন্দান্ত বুক ট্রাস্ট

বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৮ ভক্তিবেন্দান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪২ বর্ষ ▪ ৩য় সংখ্যা ▪ ত্রিবিক্রম ৫৩২ ▪ মে ২০১৮

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

হিংসা কি সর্বদাই পাপ ?

শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বে শুধুমাত্র ধর্মীয়
জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা
করা এবং যারা জীবনের প্রকৃত
উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে তাদের
বিনাশ করার জন্যই অবতীর্ণ
হয়েছিলেন।



১১

২০ আচার্য বাণী

মহাজন কথা — দেবর্ষি নারদ

শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর লীলায় নারদ
মুনি শ্রীবাস ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ
হন। মহাপ্রভু তাঁর সংকীর্তনের জন্য
শ্রীবাস অঙ্গনকে মনোনয়ন
করেছিলেন যা বৃন্দাবন লীলার
রাসস্থলীর সঙ্গে তুলনীয়।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রভু বলে, কহিলাম এই
মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া
সবে করিয়া নির্বন্ধ। —
‘নির্বন্ধ’ করে জপ করার
অর্থ কি? ...

১৮ ছোটদের আসর

অর্জুনাচার্যের কাহিনী



৪

১০ প্রচ্ছদ কাহিনী

বিশেষ ডিসকাউন্টের মাস ‘পুরুষোত্তম মাস’

পুরাণে বারো মাসের মধ্যে তিনটি
মাসকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন — বৈশাখ
মাস, মাঘ মাস ও কার্তিক মাস। এই
তিনটি মাসের থেকে আরো গুরুত্ব
প্রদান করেছেন ‘পুরুষোত্তম মাস’ কে,
যে মাসটি আসে বর্ষশ মাস পরে।

২৫ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

গীতাভূষণম্-২

ভগবানের জন্য নিষ্কাম সেবা করলে
একজন জড় জাগতিক বন্ধন থেকে
মুক্তি লাভ করেন। এইরূপ ব্যক্তি
যিনি আত্মতত্ত্ব জানী এবং
দেহাত্মবোধ থেকে মুক্ত তিনি জড়
জাগতিক সুখ সম্বন্ধে কোন আকর্ষণ
অনুভব করেন না।

১৩ ইসকন সমাচার

ভারতের মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর
সঙ্গে মহাপ্রভু দাসের
সাক্ষাৎ

২৪ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

এঁচড় বিরিয়ানী

৭ উৎসব

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ

এই পবিত্র ধামে অসংখ্য লীলা চলছে।
তাই আমাদের এই পবিত্র ধাম দর্শন
করা উচিত যাতে আমরা কলুষ থেকে
মুক্ত হতে পারি এবং নিজেদেরকে
ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে পারি।
এটি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল।

১৫ আদর্শ জীবন

যখন সন্তানসবাদীদের
বুলেট রক্ত বারায় একমাত্র
পবিত্র গ্রন্থসকলই সেই
ক্ষত উপশম করতে পারে

ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্তনই সব
থেকে শক্তিশালী ঔষধ কারণ চিন্ময়
বাণীর কথামুত মানব হৃদয়কে বিশুদ্ধ
করে তার পাপাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে
এবং একই সঙ্গে পুণ্য জীবনযাপনে
উৎসাহিত করে।

৩০ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন তালবন

তাড়সি গ্রামের পশ্চিমভাগে পবিত্র
তালবনকুণ্ড রয়েছে। তার তীরে
বলরাম ও শিবের মন্দির আছে।
বলা হয় তালবনে যে কোনও কুণ্ডে
স্নান করলে দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণচরণ
প্রাপ্তি হয়।



২৬

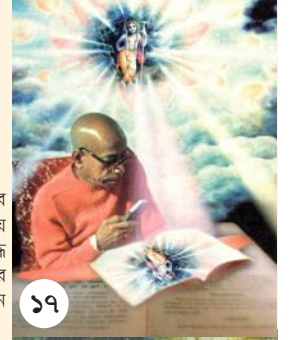
২৯ ভক্তি কবিতা

সংকটনাশন
লক্ষ্মীনৃসিংহ স্তোত্র



৭

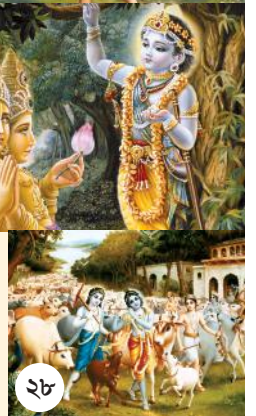
প্রবন্ধ



১৭



২০



২৮

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা
করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমাণ্বিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক
সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল
জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।



আমাদের প্রকোশ মুহূর্তে গ্রন্থান করতে হতে পারে

একদা এক সাধুর আশ্রমে এক ভ্রমণার্থী এসেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সাধু অত্যন্ত সাধারণ কুটির বাস করেন। চারিদিকে তাকিয়ে তিনি সেই গৃহে কোন মূল্যবান বস্তু দেখতে পেলেন না — কোন বিছানা নেই, কোন আলমারী, চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ ইত্যাদি কিছুই নেই। ভ্রমণার্থী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মহাশয়, আপনার আসবাবপত্র কোথায়?’ সাধু উত্তর দিলেন, ‘আপনার আসবাবপত্র কোথায়?’ ভ্রমণার্থী যুক্তি দিলেন, ‘আমি এখানে একজন ভ্রমণার্থী এবং অতি অল্প সময়ের জন্য এখানে থাকবো।’ সাধু বললেন, ‘আমিও তাই।’

যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন যাতে বেশী কষ্ট না হয় সেজন্য কম জিনিসপত্র বহন করতে চেষ্টা করি। আমরা শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি বহন করি। এই পৃথিবীতেও আমরা ভ্রমণার্থী, ইচ্ছা থাকলেও আমরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে যে, আমরা স্থায়ীভাবে এখানে থাকবো এবং সেই জন্য আমরা সমানেই জিনিস রাশিকৃত করতে থাকি। কৃষ্ণ আমাদের বলেছেন যে, এই পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সকল অভিলাষ এবং প্রভুত্বের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। (গীতা ২।৭১)

কিন্তু আমরা ভাবি, ‘যত বেশী আমরা সঞ্চয় করবো, আমরা তত বেশী সুখী হব।’ সেইজন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করি। অনেক উপার্জন করি যাতে আমরা অধিক সঞ্চয় করতে পারি। আমরা যত বেশী সঞ্চয়ের অভিলাষ করবো তত অসুখী হব। আমরা আমাদের সকল অভিলাষ কখনোই পূর্ণ করতে পারি না।

যেহেতু আমরা সমগ্র বিশ্বে ভ্রমণ করি, আমাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হলে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। মৃত্যুদূতের বর্ধির কর্ণে আমরা বৃথাই আমাদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়াস করি। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। আমি এই লেখা যখন লিখছি তখনো আসতে পারে আবার যখন আপনি এই লেখা পড়ছেন তখনও আসতে পারে। অধিকাংশ সময়েই অজান্তে মৃত্যু আসে। আমাদের পার্থিব পদমর্যাদাকে ব্যবহার করে আমরা কখনোই মৃত্যুদূতের পরোয়ানা অমান্য করতে পারি না। আমাদের সকল সম্পদ থাকলেও আমরা তাদের উৎকোচ দিতে পারি না। যখন আমাদের যেতে হবে তখন আমাদের যেতেই হবে এবং যেকোনো মুহূর্তেই আমাদের যেতে হতে পারে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং যার কাছে এই পৃথিবীর বহু রহস্যের সমাধান ছিল, মৃত্যুদূতের ডাকে তাকেও তার সমস্ত গবেষণা গুটিয়ে তাদের সঙ্গে চলে যেতে হয়েছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী দুবাই-এ তার স্বামীর সঙ্গে নৈশভোজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন এবং তার স্বামী তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী জানতেন না যে, সেখানে আরও একজন অনাঙ্কত অতিথি ছিলেন। যিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কবি এবং ভক্ত গোবিন্দদাস কবিরাজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এই পৃথিবীতে সকলই অনিত্য —

এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদলজল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।

ধন, জন যৌবন এবং পুত্র পরিজনের মধ্যে কোন প্রকৃত সুখের নিশ্চয়তা আছে? জীবন পদপত্রে এক বিন্দু জলের মতো টলমল করছে; সুতরাং তোমার সর্বদা ভগবান শ্রীহরির চরণ কমলের স্মরণ, সেবা এবং অর্চনায় নিয়োজিত থাকা উচিত। ❀



হিংসা কি সর্বদাই পাপ?

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য



অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ।।

‘হায়! কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। — ভগবদ্গীতা ১।৪৪

অর্জুন এখানে ভাবছেন যে, তার ব্যক্তিগত সুখসন্তোষ, রাজ্যসুখ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়। এই যুদ্ধ অর্জুনের সন্তোষের জন্য নয়, শ্রীকৃষ্ণের নিজ সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই হলো সাধারণ কর্ম এবং ভক্তিমূলক সেবার মধ্যে পার্থক্য। বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে ভক্তিমূলক সেবা এবং সাধারণ কর্মে কোন অন্তর না থাকলেও এই দুইয়ের ভিতর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

সমগ্র জগত এক পরিবার

লোকের মধ্যে প্রায়ই এই ভুল ধারণা থাকে যে, মহাভারত একটি সাধারণ যুদ্ধ ছিল। কিন্তু তা নয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য

ছিল পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ (গীতা ৪।৮)। তিনি এই গ্রহে, এই বিশ্বে শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং যারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে তাদের বিনাশ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এখানে স্বজনম্ কথার অর্থ জ্ঞাতি কুটুম্ব। জ্ঞাতি কুটুম্ব কথার অর্থ শুধুমাত্র আমার ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা বা পিতৃব্য নয় — আমার প্রত্যক্ষ আত্মীয়স্বজন। স্বজনম্ অর্থাৎ সকল জীবাত্মা, কারণ ভগবান সকলের পিতা, সকল ধর্মই একথা ঘোষিত হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (১৪।৪) কৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন, অহং বীজপ্রদঃ পিতাঃ ‘আমি বীজ প্রদানকারী পিতা।’

অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে (গীতা ১০।৮)ঃ সমস্ত কিছুই তাঁর থেকে এসেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কোন ভক্ত কখনও কোন জীবাত্মার ক্ষতিসাধন করে না। এই হলো কৃষ্ণভাবনামৃত।

এই হলো একজন প্রকৃত শিক্ষিত পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি সমদর্শিনঃ সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। যেমন কৃষ্ণ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর ভক্তও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সকলকেই একই পরিবারের সদস্য, স্বজন বলে মনে করেন। সেই জীবাত্মা কোন্ দেহে অবস্থান করছেন তিনি সেটি বিচার করেন না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

‘জ্ঞানবান পন্ডিতেরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চন্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।’ (গীতা



৫।১৮) অবশ্যই বহিরঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি একজন ব্রাহ্মণ এবং একটি কুকুরের সঙ্গে সম ব্যবহার করব না। সেটি বহিরঙ্গের আচরণ। কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে আমাদের অবগত থাকা উচিত যে, ব্রাহ্মণ এবং কুকুরের মধ্যে একই আত্মা অবস্থান করছে। একেই বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান অথবা আত্মতত্ত্বজ্ঞান। যখন কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তখন সকলের প্রতি সে সমদর্শী হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু

(গীতা ১৮।৫৪)

অর্জুন এখানে বলছেন, অহো বত মহৎ পাপং। মহৎ পাপং অর্থাৎ একটি মহাপাপ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি সাধনের জন্য, রসেন্দ্রিয় অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক কাউকে হত্যা করাকে মহাপাপরূপে গণ্য করা হয় কারণ সকলেই আমাদের স্বজন। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ভাবেন, ‘নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরাও আমাদের পরিবারের সদস্য। যদি আমি আমার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাদের হত্যা করি তাহলে সেটি পাপ।’ দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এই হত্যালীলাতে উৎসাহ প্রদান করে। যদিও এটি নিষিদ্ধ তবুও ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করছে। এই সব পাপ কর্ম করে কিভাবে তারা সুখে জীবন ধারণ করতে পারে?

ঠিক এবং ভুল — কিভাবে নির্ধারণ হবে

অর্জুন এখন ভাবছেন, ‘রাজ্য লাভের জন্য এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, আমি আমার জ্ঞাতীদের হত্যা করতে যাচ্ছি। এটি মহাপাপ।’ এটি সত্য। যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুধুমাত্র অর্জুনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য সংঘটিত হতো তাহলে এটি অবশ্যই মহাপাপ হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অর্জুনের

সন্তোষ সাধনের জন্য নয়; কৃষ্ণের সন্তোষ সাধনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। একজন কর্মী তার নিজের সন্তোষ সাধনের জন্য কর্ম করেন। কিন্তু একজন ভক্ত কৃষ্ণের সন্তোষ সাধনের জন্য কর্ম করেন। বহিরঙ্গভাবে দুটি কর্মই একই রকম দেখায় কিন্তু এখানে এক বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। উপসংহার হলো এই যে, যদি আমরা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম করি তা হলে সেটি মহাপাপ। কিন্তু একই কর্ম যদি আমরা কৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছা পূরণের জন্য করি তাহলে সেটি পারমার্থিক প্রগতি। এটিই হচ্ছে পার্থক্য। কৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছা পূরণ হেতু কর্ম মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে, গৃহে অর্থাৎ ভগবৎধামে ফিরে যেতে সাহায্য করে। তোমার চেতনাকে পারিবারিত করতে হবে। তুমি কি করছো? কার জন্য করছো? নিজের জন্য না কৃষ্ণের জন্য? এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। সেটিই হলো জীবনের শুদ্ধিকরণ, তুমি যেই হও না কেন, তুমি যা-ই কর না কেন, এটি কোন বিষয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এর সত্যতা বর্ণনা করা আছে :

অতঃ পুস্তির্দিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিহরিতোষণম্।।

হরিতোষণম্ অর্থাৎ ভগবানের সম্ভৃষ্টি বিধান। এই হলো শুদ্ধিকরণ। তুমি কি করছো সেটি বিষয় নয়। ‘তুমি যা-ই কর না কেন’ এর অর্থ নয় যে, তোমার যে কোন অর্থহীন কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে, না। বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে বর্ণ বিভাজন রয়েছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা উচিত। সুতরাং এটিকে বর্ণাশ্রম বলা হয় — ইতিমধ্যেই বর্ণ অনুযায়ী কর্ম তালিকা দেওয়া রয়েছে। যখন কেউ কৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছা পূরণের জন্য তার বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্ম করে, সেটিই জীবনের



পূর্ণতা। তুমি শূদ্র কি তুমি ব্রাহ্মণ সেটি বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু যদি তুমি কৃষ্ণের প্রীতিসাধনের জন্য নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্ম কর তবেই তোমার জীবন পূর্ণ। সেটিই কাম্য। সমগ্র মানব সভ্যতাই এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিভাজন অবশ্যস্বাবী। বর্ণ অনুযায়ী বিভাজন রয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কর্ম করা উচিত। প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সুতরাং আমাদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা উচিত। তাদের ব্রাহ্মণ হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যারা বীর শক্তিশালী, তাদের ক্ষত্রিয়রূপে চিহ্নিত করা উচিত। যারা ব্যবসা বুদ্ধিতে চতুর তাদের বৈশ্য হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা উচিত। একই কথা শূদ্রদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেককে কৃষ্ণের সন্তোষ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিহরিতোষণম্।

শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বে শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং যারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে তাদের বিনাশ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কৃষ্ণের শিষ্য অর্জুন প্রকৃতিতে যোদ্ধা তাই সে যুদ্ধে রত। যেহেতু সে একজন ভক্ত সে সঠিক ভাবেই চিন্তা করছে, ‘আমার আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য আমি আমার জ্ঞাতিদের হত্যা করতে যাচ্ছি? ওহ! কি ভীষণ মহাপাপ আমি করতে যাচ্ছি।’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কখনো তাঁর ভক্তকে পাপ কর্মে নিয়োজিত করেন না। না, সেটি কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কখনোই নয়। আপাতদৃষ্টিতে এটি মনে হতে পারে যে, কৃষ্ণ অর্জুনকে পাপ কর্মে নিয়োজিত করছেন, কিন্তু এটি পাপকার্য নয়। কৃষ্ণ যা করেন তা কখনোই পাপ নয়; সেটি চিন্ময়, সেটি পরম শুদ্ধ কর্ম। মহামুর্খেরা যারা কৃষ্ণকে জানতে পারে না তারা বলে কৃষ্ণ অনৈতিক কর্ম করছে, তারা জানে না কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণের কর্ম কি। তারা তর্ক করে ‘কেন কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছেন যারা অপরের পত্নী বা ভগিনী? এটি পাপ।’ এর কারণ তারা কৃষ্ণের অবস্থান সম্বন্ধে অবগত নয়। কৃষ্ণ যে কোন কর্ম করতে পারেন। তেজীয় সং ন দোষায়ঃ’ ঐশ্বরিক শক্তিমান নিয়ন্তাদের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা আপাত দৃষ্টিতে সমাজনীতির দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তারা আগুনের মতোই সর্বভুক হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন,

(ভাগবত ১০।৩৩।২৯)

উদাহরণস্বরূপ সূর্য খুবই শক্তিশালী। সে সমুদ্রের জলকে বাষ্পে পরিণত করে এমন কি মৃত্র এবং নর্দমার মতো কুস্থানের জলকেও বাষ্পে পরিণত করে। কিন্তু এর ফলে সূর্য কি কলুষিত হয়? না। বরং সূর্য তার শোধনকারী প্রকৃতির দ্বারা স্থানটিকে শোধন করে। অনুরূপভাবে কৃষ্ণের প্রকৃতিও শোধনকারী। কৃষ্ণের কাছে কেউ শুদ্ধ অথবা নৈতিক উদ্দেশ্যে না এলেও সে পরিশোধিত হয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ কোন অশুদ্ধতা দ্বারা কলুষিত হন না। কৃষ্ণকে অনৈতিক বলার আগে এই বিজ্ঞানটিকে সকলের অনুধাবন করা উচিত। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশিচ্ছ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশিচ্ছ্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

(গীতা ৭।৩)

‘হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।’

সুতরাং কৃষ্ণ অনৈতিক নন। তিনি অর্জুনকে স্বজন হত্যার মতো পাপ কর্মে নিয়োজিত করছেন না। কৃষ্ণ তাকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছেন। যখন অর্জুন অনুধাবন করেন, ‘এই যুদ্ধ আমার প্রীতিসাধনের জন্য নয়, কৃষ্ণের প্রীতিসাধনের জন্য সংঘটিত হচ্ছে,’ তখন তিনি যুদ্ধ করতে সম্মত হন, কারণ তিনি একজন ভক্ত। করিষ্যে বচনং তব (গীতা ১৮।৭৩) : ‘হ্যাঁ আমি এখন কর্ম করব।’

স্বার্থপরতা এবং স্বার্থশূন্যতা

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’। কাম অর্থাৎ লালসা, যা নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভিলাষ। অপরপক্ষে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম। ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের অভিলাষ হলো প্রেম।’ প্রকৃতপক্ষে একই কর্ম, কিন্তু একটি স্বার্থপরতা আর অপরটি কৃষ্ণের জন্য। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অর্থ হলো আমরা সঠিক তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। আমরা খেয়ালখুশী মতো কিছু করে ভাবতে পারি না ‘আমি এটি কৃষ্ণের জন্য করছি।’ এখানে অন্য বিপদ আছে। সেই জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর তত্ত্বাবধানে থাকা প্রয়োজন। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে (চৈ.চ. মধ্য ১৯।১৫১) : তোমাকে কৃষ্ণ এবং গুরু উভয়ের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে, এটা ভাবলে চলবে না যে, তুমি এতটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছো যে কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ যোগ সাধন হতে পারে এবং তুমি যা-ই করছ



তা সকলই চিন্ময়। না, অবশ্যই তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে।

সাবধানতার সঙ্গে জ্ঞানের উৎস নির্ধারণ করা উচিত

এই জ্ঞান অবশ্যই পরম্পরা ধারার মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হবে। এবং পরম্পরা প্রাপ্তিমিমাং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (গীতা ৪।২)। সুতরাং শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা একজন কখনোই ভগবদ্গীতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, ভক্তোহসি মে সখা চেতি (গীতা ৪।৩) : ভক্ত না হয়ে তুমি কখনোই গীতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

সেই জন্য সনাতন গোস্বামী আমাদের কোন অবৈষণব ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে নিষেধ করেছেন। অবৈষণব-মুখোন্দীর্ণম্ পূতং হরিকথামুতং শ্রবণং নৈব কর্তব্যং ॥

প্রথমতঃ আমাদের দেখতে হবে কে কৃষ্ণকথা বলছেন। তিনি কি কৃষ্ণভক্ত? তিনি বৈষণব অথবা বৈষণব নন? যদি না হন তা হলে অবিলম্বে পরিত্যাগ করা উচিত : ‘ওহ! আমরা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না।’ কিন্তু লোকে জানে না। যেহেতু তারা যে কোন মুখের কাছে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করে তাই তারা এই দর্শন সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ সর্পের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হলে দুগ্ধ বা মন বিষাক্ত হয়ে যায়। সেইরূপে অবৈষণবের মুখ নিঃসৃত কৃষ্ণকথাও বিষাক্ত। সেই জন্য কৃষ্ণের ভক্ত নন এমন কোন অবৈষণবের কাছে ভগবদ্গীতা বা কৃষ্ণকথা শ্রবণ নিষিদ্ধ।

পরিব্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ (গীতা ৪।৮), কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। অর্জুন নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্ম করছেন। ✨

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ



সমস্ত মানুষকে দ্রুত পলায়ন করতে দেখেন তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি ভাবেন, ‘সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করা ঠিক নয়।’ শ্রীবাস ঠাকুর এবং মুরারী গুপ্ত ভগবানকে বলেন, ‘আপনাকে শুধুমাত্র দর্শন করেই সকলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তারা সকলেই মুক্তি পেয়েছে।’

ভগবান শ্রীচৈতন্যের ষড়ভূজ প্রকাশ রূপ রয়েছে। প্রধানটি আমরা জানি যেখানে ভগবান শ্রীচৈতন্য দুই হস্তে দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ করে আছেন, তাঁর দুই বাহুতে তিনি বংশী ধারণ করেছেন এবং অপর দুই বাহুতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তীর ধনুও ধারণ করে আছেন। কতিপয় পণ্ডিতবর্গ ব্যাখ্যা করেন ভগবান শ্রীচৈতন্য অপর একপ্রকার ষড়ভূজ প্রকাশ রূপ দর্শন করিয়েছেন। তাঁর দুই হস্ত ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো, দুই বাহু ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এবং অপর দুই বাহু ছিল ভগবান নৃসিংহদেবের মতো। নৃসিংহদেব রূপে তাঁর একটি হস্ত উর্ধ্ব এবং একটি হস্ত নিম্নে অবস্থান করছিল। এক হস্ত দিয়ে তিনি প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করছেন এবং অপর হস্ত দিয়ে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন।

মুরারীগুপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করছিলেন। যখন তিনি ভগবান নৃসিংহদেবের নাম পাঠ করেন, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে নৃসিংহদেব অবতারের ভাবের প্রকাশ হয় এবং একটি দণ্ড ধারণ করে তিনি গর্জন করতে শুরু করেন। ‘আমি সমস্ত দৈত্যদের নিধন করব’ এই চিৎকার করতে করতে তিনি দ্রুত বেগে রাস্তায় ধাবিত হন। যখন মানুষেরা তাঁকে এই রূপে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে রাস্তায় ধাবিত হতে দেখেন তখন তারা ভীত হয়। যখন তিনি

সুতরাং ভগবান শ্রীচৈতন্য হলেন কৃপা সিদ্ধ এবং সকল অবতারগণই তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন। কখনো কখনো যখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণের আবির্ভাব তিথি পালন করতেন, তিনি ভগবানের দশাবতার বা অসংখ্য অবতার সম্বন্ধে কমই উল্লেখ করতেন। কারণ সকল অবতারের উৎস হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমরা তাঁদের সেই সম্পর্ক অনুযায়ী আরাধনা করি, কিন্তু প্রত্যেক বিগ্রহ স্বরূপের আলাদা আলাদা মন্দির স্থাপন করি না।

অন্ধ্রপ্রদেশে ভগবান নৃসিংহদেবের এক বিশেষ শ্রীবিগ্রহ বর্তমান এবং দূর দুরান্ত থেকে ভক্তরা সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে আসে। এই শ্রীবিগ্রহের বিশেষত্ব হলো এই যে, তাঁকে এক গ্লাস গুড় ও জলের মিশ্রণ (সরবত) তুলসী সহযোগে নিবেদন করা হয়। ভগবানের সামনেই শুধুমাত্র ভোগনিবেদন করা হয় না। ভগবানের মুখ খোলা এবং সমগ্র সরবতটি তাঁর শ্রীমুখে নিবেদন করা হয়। ভগবান সশব্দে পান করেন। তিনি সম্পূর্ণ গ্লাস পান করে অর্ধেক কাপ গুড়ের সরবত উদ্দীর্ণ করেন এবং সেটি প্রসাদ হিসাবে বিতরিত হয়।

এই পবিত্র ধামে অসংখ্য লীলা চলছে। তাই আমাদের এই পবিত্র ধাম দর্শন করা উচিত যাতে আমরা কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং নিজেদেরকে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। এটি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল।

বিশাখাপত্তনমে অন্য এক মন্দিরে নৃসিংহদেব উগ্ররূপে অবস্থান করছেন। সমগ্র বৎসর ব্যাপী ভগবানকে পুরু চন্দনের আস্তরণে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু বৎসরে একবার, সম্ভবতঃ নৃসিংহ চতুর্দশী তিথিতে তারা সেই চন্দনের প্রলেপ আনাবৃত করেন এবং ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহের প্রকৃতরূপ দর্শন করেন। পরদিন আবার তাঁকে শীতল রাখার জন্য পুনরায় চন্দনের প্রলেপে আবৃত করা হয়।

হিরণ্যকশিপু নিধন লীলা সমাপ্ত করে ভগবান নৃসিংহদেব একটি সরোবরে হস্ত ধৌত করেছিলেন। তারপর তিনি নবদ্বীপ গমন করে সেখানে বিশ্রাম করেন। নবদ্বীপে সকল দেবতাগণ গ্রামবাসী রূপে অবতীর্ণ হন। সেখানে বিভিন্ন পাহাড় ছিল যেমন ইন্দ্রটিলা, অর্কটিলা — সেখানে মোট সাতটি পাহাড় ছিল। দেবতারা সকলে আসতেন এবং অতি দীন সেবকের ন্যায় ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা করতেন।

নবদ্বীপ ধাম হলো নিত্য ধাম, ঠিক যেমন অযোধ্যা, মথুরা। এটি এমন নয় যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের কারণেই পবিত্র হয়েছিল, এটি সর্বদাই শুদ্ধ পবিত্র এবং নিত্যধাম কারণ অযোধ্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যধাম। যতবার তিনি অবতার গ্রহণ করেছেন তিনি সেখানেই অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং যখন ভগবান নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হন তিনি জানেন যে, ‘এই সেই স্থান যেখানে আমি আমার লীলা সম্পাদন করেছি। এটি পবিত্র ধাম।’

যখন ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি নবদ্বীপেও আগমন করেছিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন দেবদেবী

ও ভক্তগণ একান্তভাবে তাঁর আরাধনা করেছিলেন। আমরা ভগবান নৃসিংহদেবের যে কীর্তন করি সেটি কবি জয়দেব রচনা করেছিলেন —

তব করকমল বরে নখমদ্রুত-শৃঙ্গম
দলিত হিরণ্যকশিপু - তনু ভৃঙ্গম
কেশবধৃত - নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরি
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে

তিনি প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথপুরী যাত্রার পূর্বে মায়াপুরেই বসবাস করতেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানের অনতি দূরেই একটি স্থান বিদ্যমান যা জয়দেব পাট নামে পরিচিত।

এই পবিত্র ধামে অসংখ্য লীলা চলছে। তাই আমাদের এই পবিত্র ধাম দর্শন করা উচিত যাতে আমরা কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং নিজেদেরকে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। এটি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল। আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই কৃষ্ণকে স্মরণ করতেন। এটিই ছিল তার বিশেষ গুণ।



শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য। বর্তমানে তিনি ইসকন গভর্নিং বডি'র কমিশনার এবং তৎসহ ইসকন-এর মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক প্রধান কার্যালয়ের সহ-নির্দেশক। তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ইসকন-এ যোগদান করেন এবং বিগত ৪৬ বৎসর ধরে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ১। প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।। — ‘নির্বন্ধ’ করে জপ করার অর্থ কি?

— দেবকুমার চক্রবর্তী, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর : শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, ‘নির্বন্ধ’ - শব্দে বিধিমতে সংখ্যা নাম গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। এই মহামন্ত্র প্রতিদিন নির্ধারিত সংখ্যায় জপ করে চলতে হবে। প্রতিটি জপগুটি ধরে সুস্পষ্ট করে পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে হরিনাম জপ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ এটি আমাদের মনকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও রাধামাধবের কৃপাকটাক্ষ লাভ করার এ এক অমোঘ বিধান।

কলিযুগের মানুষ হাবিজাবি কথা বলতে ভালোবাসে। কলহ, তর্ক, বিবাদ প্রজন্ম করার প্রবণতা তাদের ভালোই আছে। এমন কি বেশী আজোবাজে ভাষা ব্যবহার করার ফলে মেজাজ বিক্ষুব্ধ হয়, এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্র মারামারি, হাতাহাতি, খুনাখুনি করে মানুষ আরও বহু সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। মোবাইল ফেসবুক মানুষকে একটা নেশাগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত করে তার বহু সময় নষ্ট করে। সংসারে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরক্তিকর কদর্য ব্যক্তিরূপেই লোক আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু, কলিযুগের ধর্ম হরিনাম গ্রহণে যাঁরা ব্রতী হন, তাঁরা স্বভাবতই শান্তি, স্থিরতা, ধৈর্যশীলতা বজায় রাখার শক্তি লাভ করেন। সংসারের কর্তব্য কর্মেও তাঁদের যত্নশীলতা বৃদ্ধি পায়।

অক্লিঞ্জন না হলে যেমন আমাদের চলে না, সেই রকম হরিনাম ঠিক না হলে ভক্তিজীবন চলে না। হরিনাম অবহেলা করার কোনও অর্থ হয় না। প্রতিদিন মনোযোগ সহকারে, দৃঢ়তা ও আগ্রহ সহকারে ভগবৎ পাদপদ্মে মতি রেখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। যেমন, আমাদের কমপক্ষে যোলো মালা জপ করতেই হবে। ‘নির্বন্ধ’ শব্দটিতে বিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা, নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারকে যেমন ইঙ্গিত করে, তেমনই দৃঢ়তা, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়কেও বোঝায়।

প্রশ্ন ২। ‘সংসার নির্বাহ করি, যাব আমি বৃন্দাবন। ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন, এ আশায় নাহি প্রয়োজন।’ — ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই গানটিতে ‘ঋণত্রয় শোধ’ কথাটির অর্থ কি?

উত্তর : স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমরা তিন রকমের দেনা বা ঋণে দায়বদ্ধ। সেই ঋণ পরিশোধ করাই আমাদের কর্তব্য। দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ।

বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের কাছে আমরা ঋণী। যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধিত হয়। যেমন কলিযুগে হরিনাম যজ্ঞ।

নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি দেবতাদের কাছে আমরা ঋণী। তাঁরা আমাদের আদর্শ শিক্ষক বা আচার্য। ব্রহ্মাচার্য ব্রত এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধিত হয়।

পিতৃপুরুষদের কাছে আমরা ঋণী। সুসন্তান উৎপাদন কিংবা শিষ্য বা ভক্ত তৈরি করার দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধিত হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভজন করছে না, অথচ ভাবে, এ সব ঋণ শোধ করে দেবো, সেটি দুরাশা মাত্র। সে নিজের এবং অন্য কারোর কোনও সুখ শান্তি বা মঙ্গল বা প্রীতিজনক ব্যক্তিত্ব হয় না। 🌸

প্রশ্নোত্তরে : সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী



বিশেষ ডিসকাউন্টের মাস ‘পুরুষোত্তম মাস’

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

সাধারণ মানুষেরা সবসময় একটি কথাই বলে থাকেন, ‘আমরা সংসারী মানুষ বিষয়ের চিন্তায় সবসময় মেতে থাকি— এমন কি আত্মীয়-স্বজন-ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সকলকে নিয়ে থাকতে হয় — তাই চারটি পাপ কর্ম ত্যাগ করে হরিভজন করা খুবই কষ্টকর — তাই ‘সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করছি — ভগবান ভক্তিয়োগ অনুশীলন করতে গেলে ডিসকাউন্ট দেন কি না? এখন তো বাজারে যে কোন জিনিস কিনতে যাবেন অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন।’ এইরকম প্রশ্নের উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতা বারো অধ্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ভগবান শুধুমাত্র ডিসকাউন্টই দেন না; আপনি ইন্সটলমেন্টেও ভক্তিয়োগ শুরু করতে পারেন। এমন কি পুরাণে বারো মাসের মধ্যে তিনটি মাসকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন— বৈশাখ মাস, মাঘ মাস ও কার্তিক মাস। এই তিনটি মাসের থেকে আরো গুরুত্ব প্রদান করেছেন ‘পুরুষোত্তম মাস’ কে, যে মাসটি আসে বক্রিশ মাস পরে। সেই মাসটি কিভাবে আসে সেই মাসের মাহাত্ম্য কি আমাদের সকলের

জানা প্রয়োজন। আমি সাধু-গুরুর মুখ হতে যা শ্রবণ করেছি সেটা লেখার চেষ্টা করবো মাত্র।

চান্দ্র মাস ও সৌর মাসের মিল রাখার জন্য ৩২ মাসে একটি করে মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসের নাম অধিমােস। যে মাসে দুটি পূর্ণিমা বা দুটি অমাবস্যা তিথির আগমন ঘটে। স্মার্ত ও পরমার্থ ভেদে বৈদিক শাস্ত্রে দুই রকমের বিধি আছে— একটি কর্মকাণ্ডীয় বিধি আর একটি পরমার্থ বিধি। কর্মকাণ্ডীয় মতে এই অধিমােস কে ‘মল’ মাস বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং কোন শুভ কার্য করা হয় না। কিন্তু পরমার্থ বিধি অনুসারে এই অধিমােসকে ‘পুরুষোত্তম’ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি এই মাসে যদি কেউ কোন শুভ কার্য করে থাকেন তা হলে তার অন্য যে কোন মাসের থেকে অধিক ফল লাভ করবেন।

এই প্রসঙ্গে নারদীয় পুরাণে ৩১ অধ্যায়ে অধিমােসের মাহাত্ম্য উল্লেখ আছে — এই অধিমােস নিজের অপমান (লোকেরা ‘মল’ মাস বলে ঘৃণা করে) এবং অন্যান্য বারো





মাসের আধিপত্য বিচার করে বৈকুণ্ঠের পতি ভগবান নারায়ণের সমীপে গিয়ে নিজ দুঃখের কথা জানিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ কৃপা করে অধিমাসকে সঙ্গে নিয়ে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। অধিমাসের কাহিনী শ্রবণ করে দয়াদ্র শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন, 'জগতে আমি পুরুষোত্তম রূপে বিখ্যাত। এই অধিমাসও জগতে পুরুষোত্তম মাস রূপে বিখ্যাত হলো।' তাই এই অধিমাসকে আর কেউ 'মল' মাস না বলে শাস্ত্রসম্মতভাবে 'পুরুষোত্তম মাস' বলে খ্যাত থাকবে। অন্য সমস্ত মাস সকাম কিন্তু এই 'পুরুষোত্তম মাস' নিষ্কাম। তাই যে এই মাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করবে সে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার ভক্তরা কখনও কখনও জানতে বা অজান্তে কোন অপরাধ করে থাকে কিন্তু এই মাসে কখনও অপরাধ হবে না। এই মাসে ভক্তিমূলক যে কোন সেবা যে কেউ করবে সে অধিক

ফল শুধুমাত্র পাবে তাই নয়, অবশেষে আমার ধামেও ফিরে আসবে। একসময় শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু বলেছিলেন — গীতার ১৫ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ পড়া ভালো এবং বেশী সংখ্যক জপ ও গঙ্গায় স্নান করলে ভালো। এই মাসের মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে যদি সম্ভব হয় হবিষ্যন্ন খেতে পারেন। আমিষ আহার সম্পূর্ণ বন্ধ।

শোনা যায়, মেধা ঋষির কন্যা 'পুরুষোত্তম' মাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও ঐ মাসকে অবহেলা করেছিল, — তার ফলে তাকে বহু কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। পরজন্মে সেই ঋষিকন্যা দ্রুপদ (Dhrupada) রাজার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন — নাম হয় দ্রৌপদী। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সঙ্গে 'পুরুষোত্তম' মাস ব্রত পালন করে সমস্ত বনবাস দুঃখ অতিক্রম করেছিলেন। নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামী ঋষিদেরকে বলেন, ভারতে জন্ম নিয়ে যে গৃহাসক্ত নরাধমেরা 'পুরুষোত্তম' ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভাগারা বারংবার জন্ম-মৃত্যুর যাতনা ভোগ করে এবং স্ত্রী-পুত্র-মিত্র ও কুটুম্বাদির বিয়োগজনিত দুঃখ লাভ করে। এই মাসে

পরিনিন্দা, পরচর্চা, পর অন্ন ভোজন, অসৎ শাস্ত্র পাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সম্ভব হলে বৈষ্ণব সেবা করতে পারেন।



এই মাসে কার্তিক মাসের মতোই ভগবান ‘পুরুষোত্তম’ কে প্রতিদিন অর্থাৎ ১৬ই মে, বা ১লা জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩ই জুন বা ২৯শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ঘি-প্রদীপ নিবেদন করতে হয়। আর বন্দনা গীত গাইবেন —

বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।

‘শ্রীরাধাধারীণীর সহিত আরাধ্য ভগবান পুরুষোত্তম পীতাম্বর দ্বিভুজ মুরলীধর নবঘনশ্যামকে সশ্রদ্ধ বন্দনা করি।’

পুরাণে বারো মাসের মধ্যে তিনটি মাসকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন — বৈশাখ মাস, মাঘ মাস ও কার্তিক মাস। এই তিনটি মাসের থেকে আরো গুরুত্ব প্রদান করেছেন ‘পুরুষোত্তম মাস’ কে, যে মাসটি আসে বত্রিশ মাস পরে।

হরে কৃষ্ণ, আমরা সকলেই এই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারি কারণ ভগবান কত করুণাময়। মানুষকে অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান দেবার জন্যই ভারতের মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে ভগবান বেদ, পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এই সমস্ত সাহিত্য মানুষের জন্মনা-কল্পনা প্রসূত নয়।

এখন আপনি বিশ্বাস করুন, আর না করুন ক্যামেরায় তা ধরা পড়বেই — ভাগবত ৬।১।৪২ নং শ্লোকে তা উল্লেখ আছে।



সূর্যোহগ্নিঃ খং মরুদেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশাঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম ইতি হ্যেতে দৈহস্য সাক্ষিণঃ।।

সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা স্বয়ং জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। এক সময় একটি নাস্তিক শিক্ষিত মানুষ, শ্রবণ করে বললেন সত্যি আপনাদের ভগবান ভয় দেখিয়েও আমাদেরকে ধর্মপথে আনতে পারছে না। প্রচারক ভক্তটি বললেন, সেটি আসল কথা নয়। আসলে এই জ্ঞান সমুদ্রের কাছে আমরা যে সকলেই মূর্খ সেটি স্বীকার করতে চাই না — নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে মনে করি। স্কুলে পড়েছিলাম আস্তিক বিজ্ঞানী বিশ্ববিখ্যাত স্যার আইজ্যাক নিউটন নিস্কপটে স্বীকার করেছেন — ‘অবোধ বালকের ন্যায় জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নুড়ি নিয়ে নাড়া-নাড়ি করছি মাত্র; কিন্তু সামনের রহস্য কিছুই বুঝতে পারি নি।’

এছাড়াও — একসময় বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী এরিস্টটল তাঁর এক ছাত্রকে পড়ানোর সময় লক্ষ্য করলেন, সে নিজেকে অনেক জ্ঞানী মনে করছে। তাই তিনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে মহামূর্খ বলে ভৎসনা করলেন। তাতে ছাত্রটি খুবই ব্যথিত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই এরিস্টটল নিজেকেও মূর্খ বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন ছাত্রটি আরো দুঃখ পেলো। এরিস্টটল সেই দৃশ্যটা দেখে বুঝিয়ে বললেন — ‘আসলে এই অসীম জ্ঞান সমুদ্রের কাছে তুমি ও আমি উভয়ই মূর্খ; তবে আমি যে মূর্খ তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে মূর্খ তা তুমি জানো না।’ এটাই পার্থক্য। তাই আস্তিক জগতে বাস করেও জ্ঞানের অভাবে নিজেকে নাস্তিক বলে মনে করে দুঃখ ভোগ করছেন। তাই সকলেই যাতে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য ভগবান নানারকম ডিসকাউন্টের বন্দোবস্ত করেছেন। তাই আসুন আমরা সকলেই এই ‘পুরুষোত্তম’ মাস যত্নের সঙ্গে পালন করি এবং আনন্দ উপভোগ করি। 🌸

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচার স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করেন।



বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর সঙ্গে
মহাপ্রভু দাসের সাক্ষাৎ



ইসকন নিউজ : ১৬ই ফেব্রুয়ারী মহাপ্রভু দাস, ডাইরেক্টর বেলজিয়াম মিউসিয়াম অব সেক্রেট আর্ট (MOSA) ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন দিল্লীর বাসভবনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মহাপ্রভু দাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফর্মস অব ডিভোসন - MOSA কর্তৃক দুটি ভ্যালুম-এর একটি সেট ভারতীয় কলা বিদ্যায় আধ্যাত্মিকতা, গ্রন্থটি উপহার দেন। এই কর্মকাণ্ডে, পুস্তকটির লেখক সুসমা ভাল যিনি ফর্মস অব ডিভোসন প্রদর্শনীর সহ অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। নতুন দিল্লীতে এই প্রদর্শনী ২০১৫ সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে প্রদর্শিত হয়েছিল।

মহাপ্রভু প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর সঙ্গে কোন ইউরোপিয়ান মহানগরী এই প্রদর্শনী করার ব্যাপারে আলোচনা করেন যা তার পরবর্তী এই মহাদেশ সফর সূচীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সাক্ষাৎ আট মিনিট ব্যাপী চলে।

মহাপ্রভু বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সাবলীল ছিলেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সমস্ত কথাবার্তা বলেন।' বেলজিয়ামে অবস্থিত ইসকন, রাধাদেশ কমিউনিটির দ্য মিউজিয়াম অব সেক্রেট আর্ট তার

অফিসকে উত্তমমানে উপহার চয়নে সাহায্য করে যাতে তার বিদেশ ভ্রমণকালে আন্তর্জাতিক নেতাদেরকে তা প্রদান করা যায়। তার বাসভবনও MOSA থেকে সংগৃহীত বহু শিল্পী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।

শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণের
নতুন স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে ইসকনের প্রশংসা



মাধব দাস : সম্প্রতি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এক সভায় যেখানে শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণ শ্রীল প্রভুপাদ ও ইসকনের প্রশংসা করেছেন এবং সেখানে ভক্তদেরও তাদের মতপ্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সেই চলচ্চিত্রটি মায়াপুর উৎসবে প্রদর্শিত হলে দর্শকগণ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন।

এই চলচ্চিত্রটির নির্দেশক কৃষ্ণলীলা দাসী (কৃষ্ণিনা ডাঙ্কা) এবং প্রযোজক ইসকন কমিউনিকেশনস। এতে ত্রি দিবসীয় শিক্ষামূলক সভাকে তুলে ধরা হয়েছে 'দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কৃষ্ণ মুভমেন্ট : হাফ এ সেঞ্চুরী অব গ্রোথ, ইমপ্যাক্ট এণ্ড চ্যালেঞ্জ,' যা ২০১৬-র এপ্রিলে ইসকনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের স্মরণে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে এই বৎসর ইন্টারন্যাশনাল লিডারশীপ সঙ্ঘের সমাপ্তি দিবসে ১০ই ফেব্রুয়ারীতে ৯০০

ভক্ত সমন্বিত এক হলে ইসকন কমিউনিকেশনের নির্দেশক অনুভূম দাস এই চলচ্চিত্রটি পরিবেশন করেন।

চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতে বহু ভক্তদর্শক অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। গোপাল ভট্ট দাস জি বি সির স্ট্যাটজিক প্ল্যানিং টিমের প্রধান বলেন, ‘অভূতপূর্ব’।

কৃষ্ণলীলা দাসী নির্দেশিত এবং ইসকন কমিউনিকেশনস্ প্রযোজিত অপর চলচ্চিত্র ‘দ্য জয় অব ডিভোসন’ স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। এতে বর্তমান পৃথিবীতে ইসকন কি তা প্রদর্শিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর ষাট মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রকাশিত হবে।

**ভক্তিবাদান্ত হাসপাতাল ২০ বছর ধরে
পারমাণ্বিক যত্ন দিয়ে জীবন পরিবর্তিত করছে**



ইসকন নিউজ : শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ এই অনন্য হাসপাতালটির বিংশ বার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হলো ১১ই জানুয়ারী ২০১৮। এই উৎসবে হাসপাতালের কর্মচারী, ডাক্তার, ম্যানেজার সহ তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে এটি ছিল সাত শয্যা বিশিষ্ট একটি মেডিকেল ক্যাম্প — এর নাম ছিল ‘ভক্তিবাদান্ত ক্লিনিক’। বর্তমানে এটি ১০০০ ভক্ত সম্বলিত ২১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল।

এই হাসপাতালে ছটি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যাক্সিওগ্রাফি, অ্যাক্সিওপ্লাস্টিক ও ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হার্ট সেন্টার রয়েছে। ভারতবর্ষ এবং বিদেশ থেকে বছরে প্রায় ২,৫০,০০০ বহির্বিভাগীয় রোগী আসে এবং ২০,০০০ রোগী ভর্তি থাকে।

ভক্তিবাদান্ত হাসপাতালে প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে একজন পারমাণ্বিক পরামর্শদাতা যুক্ত থাকেন যিনি তাদের সঙ্গে এমনভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন যাতে তারা পারমাণ্বিক এবং জাগতিক আবেগ প্রবণ কথা বলতে পারে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা এই হাসপাতালে সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্ট আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়। চতুর্দিকে কৃষ্ণভাবনা সম্পন্ন চিত্র, ধূপের গন্ধ এবং দিনে চব্বিশ ঘন্টাই কীর্তন চলতে থাকে।

**ভারতীয় কীর্তনের অদ্ভুত রোমাঞ্চে
অংশগ্রহণকারীগণ ভক্তিরসে নিমজ্জিত**

ইসকন নিউজ : তিন প্রজন্মের ভক্ত কীর্তন শিল্পী গৌরবানী, তার মাতা রুক্মিণী দাসী এবং তার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা টেরভা এই শীতে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রের একদল কীর্তন প্রেমীকে নেতৃত্ব দিয়ে সারা জীবনের জন্য এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আন্বাদন করিয়েছেন।

এই দলে ছাব্বিশজন আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত আশ্রিত এবং নবীন ভক্ত ছিলেন।

এই যাত্রাটি একটি বার্ষিক প্রকল্প যা ১৫ই জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলেছিল।

এই যাত্রাকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

**ফ্লোরিডার হরেকৃষ্ণ স্কুল
সেবার শিক্ষাদান করছে**

ইসকন নিউজ : আলাচুয়া, ফ্লা — আর্ট প্রোজেক্টটি অন্যান্যগুলির থেকে আলাদা ছিল। ভক্তিবাদান্ত অ্যাকাডেমীর ছাত্রদের কিছু আবর্জনা দিয়ে একটি ৫০ পাউন্ডের কম ওজনের শিল্পকর্ম করতে দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রোজেক্টটি, আবর্জনার রূপান্তরকরণ, আলাচুয়া কাউন্ট কমিশনের দ্বারা আয়োজিত ১৯তম বার্ষিক স্টুডেন্ট রিসাইকেলড আর্ট কম্পিটিশনের অংশ ছিল।

এই অ্যাকাডেমীর হিন্দু ছাত্রগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল এবং আবর্জনা থেকে তৈরী তাদের এ্যাকোয়ারিয়ামটি প্রথম পুরস্কার জিতেছিল। আবর্জনা দিয়ে তৈরী তাদের অপর একটি শিল্পকর্ম, একটি শহর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

কিন্তু ছাত্রেরা পুরস্কার জেতার জন্য বা শিক্ষাক্রমের প্রশংসা লাভের জন্য এই প্রোজেক্ট করেনি। এই রূপান্তরকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতা আনাই তাদের কাম্য ছিল।

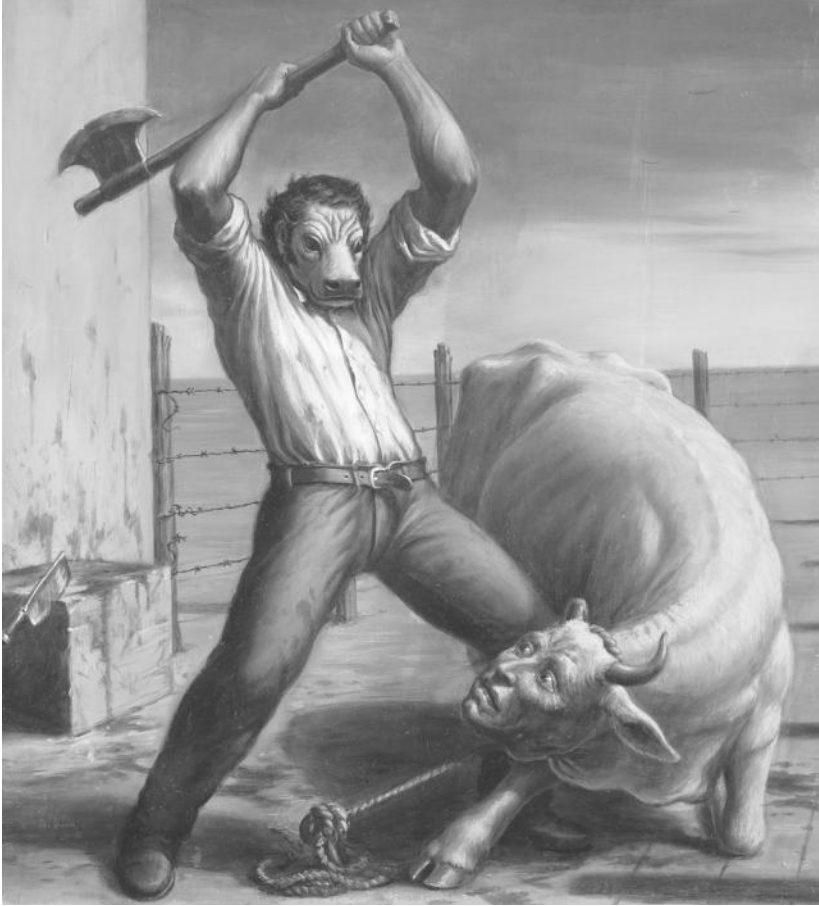
অ্যাকাডেমীর ছাত্রেরা গরীব পরিবারের জন্য খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করেছিল। কিছু ছাত্র সম্প্রতি তাদের তৈরী কাপকেক বিক্রি করে পুয়ার্তো রিকোর পরিবারগুলির জন্য খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করেছিল।

যখন সন্ত্রাসবাদীদের বুলেট রক্ত ঝাড়াই শ্রমশ্রম পবিত্র গ্রন্থসকলই সেই ঋণ উদশম করতে পারে

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

প্যারিসের গণহত্যায় আঁতোয়া লেরিসই শুধুমাত্র তার যুবতী স্ত্রীকে হারাননি। তার ১৭ মাস বয়সের ছেলেও তার মাকে হারিয়েছিল। তার স্ত্রীর হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে এক খোলা

তোমরা সেটা চাইলেও ঘৃণার প্রত্যুত্তরে ক্রোধ সেই একই অজ্ঞানতার দিকে ঠেলে দেবে যা তোমাদেরকে আজকের ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।



এই ঘৃণাপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পৈশাচিক উগ্রপন্থীরা গণহত্যার উল্লাসে মেতেছে তখন এই হত্যালীলায় ক্ষতিগ্রস্ত একজনের কাছ থেকে শান্তি ও ধৈর্যের বাণী যদিও বিস্ময়কর কিন্তু অত্যন্ত সন্তোষজনক।

সত্য, মানবতা কখনও বর্বরদের কার্যাবলীতে আবদ্ধ হয় না। ঘৃণা এবং হিংসা ছড়ানোর তাদের যে আন্দোলন তাকে অধিক ঘৃণা এবং হিংসা দ্বারা প্রতিহত করা যাবে না। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করে বিনষ্ট করা উচিত এবং পৃথিবীর সকল সরকারই এই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

বর্তমানে পৃথিবী সবার জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। উগ্রপন্থীদের পিপাসু বুলেট নিরীহ মানুষের রক্ত নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে আমাদের জীবনকে ভয়াবহ করেছে। আজ আমরা রেস্টুরেন্ট, থিয়েটার, পার্ক, প্লেন, ট্রেন, রাস্তা, অফিস এবং নিজেদের বাড়ী যেকোনো জায়গায় মারা যেতে পারি।

চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমি জানি না তোমরা কে এবং আমি তা জানতেও চাইনা, তোমরা মৃত আছা। এই যদি ভগবান হন যার নামে তোমরা অন্ধের মতো হত্যালীলায় মেতেছো। আমার স্ত্রীর দেহের প্রতিটি বুলেট তাঁর হৃদয়ে এক একটি ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘সুতরাং না, তোমাদের ঘৃণা করে আমি তোমাদের তৃপ্তি দিতে চাই না।

এই প্রশ্নের উত্তর চাই যে, কেন পৃথিবীতে এত হিংসা? কেন একে অপরকে হত্যা করে আনন্দ পায়? এই পরিস্থিতির কি উন্নতি হবে, না আরও অবনতি হবে?

মানুষের জাতিব সত্তা যখন মানবিক আবেগকে ঢেকে দেয় তখনই মানুষ অসভ্য বর্বরের মতো আচরণ করতে শুরু করে। কিন্তু জন্তুরা একে অন্যকে খাদ্যের জন্য হত্যা করে।

তারা জীবনধারণের জন্য এই কাজ করে। সুতরাং যে সকল মানুষ বাচ্চাদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না তারা কি পশুরও অধম নয়? তাদের মধ্যে কোন সহানুভূতি নেই এবং তাদের হৃদয় হিংসা এবং অজ্ঞানতায় ভরে আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়



(১৬। ৯) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আসুরিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি যারা নিজেদের কাছে হেরে গেছে, তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য ভয়ঙ্কর অপকারী কাজকর্মে নিযুক্ত। বৈদিক শাস্ত্রে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবের বিশদ বিবরণ দিয়ে এর উপায় বলা হয়েছে যা ধৈর্য ধরে অনুসরণ করলে এই পৃথিবী রক্ত এবং ভয়ে কলঙ্কিত হবে না। শ্রীমদ্ ভাগবতম্ (১২। ২। ১) বলছে যে, কলিযুগে, যে যুগে আমরা বর্তমানে বাস করছি তাতে ধর্ম এবং করুণার পতন হবে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতিগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকতার বেদিতে বলি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ হত্যাকারীদের জন্ম হচ্ছে যারা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা অসুরশক্তি নিরীহ যুবকদের সহজে বুদ্ধিভ্রষ্ট

করে, বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, এই গণহত্যা ভগবানকে সন্তুষ্ট করছে। এদের কার্যাবলী ভগবানকে এবং তাঁর প্রকৃত ভক্তদের অসম্মানিত করছে।

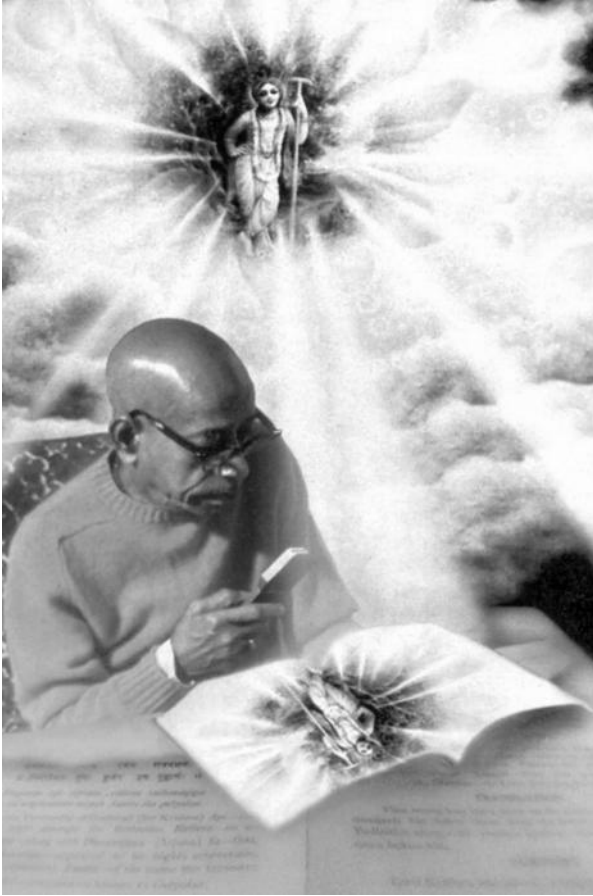
এইটি ভগবানের ভক্তদের জন্য অত্যন্ত সঙ্কটজনক সময় কারণ তাদের একই সঙ্গে দুইদিকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। একদিকে রয়েছে নাস্তিকরা, যারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং অপর দিকে হিংস্র উগ্রপন্থীরা যারা নিজেদেরকে ভগবানের মুখপাত্র বলে মনে করে।

এই বিরোধী আবহাওয়ায় ধর্মীয় রীতিনীতির আলোকবর্তিকা ধারণকারীগণের ঘুম ভেঙ্গে উঠে মানবতার শত্রুদের অধার্মিক কার্যাবলীকে পরাস্ত করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রের মতো পবিত্র গ্রন্থের 'জ্ঞানগর্ভ বাণী'ই তাদের অস্ত্র হবে। সূর্যের প্রতিটি কিরণ যেমন সহজেই অন্ধকারকে গ্রাস করে অনুরূপভাবে এই সকল গ্রন্থের প্রতিটি বাণীর অসীম শক্তি মনের আঙুনকে প্রজ্জ্বলিত করে অজ্ঞানতাকে গ্রাস করবে।

ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখনই মানবসভ্যতা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে তখন অধ্যাত্মবাদী ব্যক্তিগণ মানবতাকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভগবানের প্রতিনিধিগণ সর্বদা মানবকল্যাণমূলক কর্ম করেন এবং অবিরত তাদের সঠিক পথে চালিত করেন। কলিযুগের প্রারম্ভে পাপ পুণ্যকে আবৃত করতে শুরু করেছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে সাধুগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হন কিভাবে এই যুগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায় তার উপায় সন্ধানে। এই আলোচনায় তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা বিশদভাবে পরমেশ্বর ভগবানের



চিন্ময় বাণী, তাঁর বিভিন্ন অবতার, বিভিন্ন লীলাসমূহ এবং কিভাবে করুণাময় ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ অনুভব করে মানুষ সর্বোচ্চ লাভবান হবে তা আলোচনা করবেন। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্তনই সব থেকে শক্তিশালী ঔষুধ কারণ চিন্ময় বাণীর কথামৃত মানব হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে তার পাপাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং একই সঙ্গে পুণ্য জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। মহাত্মাগণ মানুষের হৃদয়কে ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ করে তাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটান। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের নাম জপ এবং পবিত্র বেদ সমূহ থেকে ভগবৎ কথার ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর না ছিল অর্থবল, না ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা, না ছিল বাহুবল কিন্তু শুদ্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিই মানুষের হৃদয় ও মন পরিবর্তিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর শিষ্যরা সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করে অতি সহজেই ভক্তিজীবন গ্রহণ করেছিল। মাংসাহারসহ সকল খারাপ অভ্যাস তারা পরিত্যাগ করেছিল কারণ তারা অনুভব করেছিল যে, মানুষ হিসাবে যদি আমরা ভগবানের অন্য সন্তানদের আঘাত করি তাতে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন।



ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্তনই সব থেকে শক্তিশালী ঔষুধ কারণ চিন্ময় বাণীর কথামৃত মানব হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে তার পাপাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং একই সঙ্গে পুণ্য জীবনযাপনে উৎসাহিত করে।

বাণীকে আমাদের প্রতিটি মানুষের কাছে এবং পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবত নিশ্চিত করে যে, একবার পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞান মানুষের মনকে উজ্জীবিত করলে হৃদয়ের গ্রন্থি উন্মোচিত হয় এবং সকল সংশয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (ভাঃ ১।২।২০ এবং ১।২।২১) ❀



পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন <http://krishnamagic.blogspot.co.uk/>

অর্জুনাচার্যের বণস্থির্না

শ্রীল ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

অর্জুনাচার্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর ব্যাখ্যা লিখছিলেন এবং এমন একটি শ্লোক যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘আমাদের যা আছে তিনি তা বহন করেন এবং যা নেই তা তিনি প্রদান করেন।’



সেটি কেমন যে ভগবান স্বয়ং আসবেন এবং বস্তু প্রদান করবেন? ওহ! এ সম্ভব নয়। তিনি সম্ভবত কোন ব্যক্তি-দ্বারা প্রেরণ করবেন। ‘আমি ভার বহন করি এবং প্রদান করি’ এখন আমি তাঁর বাণীটির পরিবর্তে লিখি যে, ‘আমি কিছু ব্যক্তি প্রেরণ করি যে প্রদান করে।’

কিছুসময় পর ... তিনি স্নানের জন্য প্রস্থান করলেন। ইতিমধ্যে দুইজন অতি সুন্দর বালক এক গাড়ী ভর্তি অতি মূল্যবান সামগ্রী যথা ফল, শস্য, ঘি এবং শাক সজ্জি নিয়ে এল এবং অর্জুনাচার্যের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল —



ও মাতাজী, আপনার স্বামী এই সমস্ত সামগ্রী আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।



ওহ, তোমরা কত সুন্দর বালক এবং উনি তোমাদের কে এই সমস্ত সামগ্রী দিয়েছেন এখানে আনার জন্য? আচার্য তো এতো নির্দয় নন। তিনি কেমনভাবে তোমাদেরকে এতো ভার বহনের জন্য দিলেন?



তিনি আমাদের নিজ মাথায় করে বহন করতে বলেছিলেন। আমরা এত সামগ্রী কিভাবে বহন করবো?

আমি বহনে অসম্মত হই তাই তিনি আমায় প্রহার করেন।

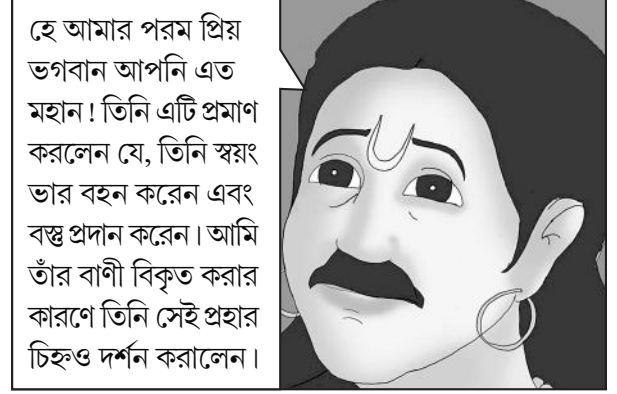


আচার্য তো এত নির্দয় নন, তিনি কিভাবে এতো নির্দয় হলেন? ঠিক আছে, এখন কিছু ফলাহার গ্রহণ কর।

এরপর যখন অর্জুনাচার্য স্নান করে ফিরে আসলেন ...



তখন অর্জুনাচার্য সমস্তই অনুধাবন করতে পারলেন।



উপদেশ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অসীম। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তা বুঝতে পারি না। তিনি প্রত্যেকটি এবং সকল জীবাত্মার সঙ্গে আদান-প্রদানের জন্য নিজেকে স্বয়ং বিস্তার করেন। — শ্রীল প্রভুপাদ ❁

এখন থেকে ঘরে বসে সরাসরি **ভগবৎ-দর্শন** পত্রিকার পাঠক হোন এবং সেইসঙ্গে আপনার পাঠক ভিক্ষা পাঠানোর সুবিধা গ্রহণ করুন নিম্নলিখিত website ব্যবহারের মাধ্যমে :- www.bhagavatdarshan.in

আপনি কি নিয়মিতভাবে
ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য
যোগাযোগ করুন :

(033) 2289 6446 / 9073791237

মহাজন কথা

পুরীদাস দাস

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র

দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে নারদ মুনি এমন একজন যিনি শুধুমাত্র ভগবদ্ভক্তের পরিচয়েই (An exclusive devotee) বিখ্যাত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান এবং অর্জুন দুইজনের মুখেই নারদমুনির কথা উঠে এসেছে। দশম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম রূপে ঘোষণা করার পরে, নারদমুনির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এটি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়। মহান ঋষিগণ যেমন নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতিরাও এই সত্য নিশ্চিত করেছেন। তার কিছু পরেই ভগবান বলেন যে, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদমুনি তাঁর বিভূতি প্রকাশ করেন।

দূরদর্শনের ধর্মীয় ধারাবাহিকগুলি পরিচালকদের করা নারদমুনি বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছেন কিন্তু সেগুলি অনেকাংশেই যথার্থ নয়। আমাদের চেষ্টা শাস্ত্রচক্ষুর মাধ্যমে, আচার্যদের তাৎপর্যের মাধ্যমে নারদমুনিকে দর্শন করবার এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করবার। শ্রীল প্রভুপাদ নারদমুনিকে বলেছেন আধ্যাত্মিক মহাকাশচারী (Transcendental Spaceman)। বীণা হাতে ভগবানের গুণকীর্তন করতে করতে নারদ মুনি জড়জগৎ ও চিদ্রজগতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহৎভাগবতামৃতে নারদমুনির প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের খোঁজে সমগ্র সৃষ্টি তথা চিদ্রজগৎ পরিভ্রমণ করার বর্ণনা রয়েছে।

এইভাবেই পরিভ্রমণ করতে করতে নারদমুনি বদ্রিকাশ্রমে ব্যাসদেবের আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যাসদেবকে বিমর্ষ দেখে নারদমুনি তার কারণ অনুসন্ধান করেন। ব্যাসদেব তাঁকে জানান যে, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি অনেক শাস্ত্র রচনা করেছেন। বেদকে চারভাগে ভাগ করেছেন, পুরাণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদান্তসূত্র আদি রচনা করেছেন। তথাপি তিনি হৃদয়ে পরিতৃপ্তি অনুভব করছেন না। ব্যাসদেবের অতৃপ্তির কারণ বিশ্লেষণ করে নারদমুনি বলেন, যদিও তিনি অনেক শাস্ত্র রচনা করেছেন, তা মূলত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চার পুরুষার্থের গুণকীর্তনে পূর্ণ, সেই তুলনায়

পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন অত্যন্ত নগণ্য। আর ভগবানের সেই গুণকীর্তনও হয়েছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দাতা রূপে। অতৈতুকী ভক্তি বা নির্মল ভগবৎ প্রেমের পরম আস্পদ রূপে নয়। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে এমনই এক শাস্ত্র লিখতে উপদেশ করেন যেখানে পুনঃ পুনঃ প্রতি ছত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দিব্য যশ অঙ্কিত হবে এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের বা শুদ্ধভক্তদের গুণ কীর্তিত হবে। সেই শাস্ত্রই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। ব্রহ্মার পরেই ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় আচার্য নারদ। ব্রহ্মা যে জ্ঞান চতুঃশ্লোকীরূপে ভগবানের থেকে লাভ করেন, তা নারদকে দশটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। নারদ তা একশটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাসদেবের নিকট প্রকাশ করেন আর ব্যাসদেব সেই দিব্য জ্ঞান আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত রূপে প্রকাশ করেন।

নারদ মুনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

ইসকনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীল ভদ্রপাদ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচারী আশ্রম। কলিযুগের অত্যন্ত কলুষিত পরিবেশে যা এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা প্রথমে চতুষ্কুমারকে সৃষ্টি করেন। তারপর, ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে একাদশ রুদ্রের সৃষ্টি হয়। তারপরেই ব্রহ্মা তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে দশ পুত্রের সৃষ্টি করেন। এঁরা হলেন মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ দিব্যভাবনা থেকে নারদ মুনির জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মার বাকি নয় পুত্র বিবাহ করে প্রজা সৃষ্টিতে লিপ্ত হলেও নারদ মুনি বিবাহ করেননি। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই যদিও নারদ মুনি জন্ম থেকেই ভগবদ্ভক্ত ছিলেন তথাপি তিনি ব্রহ্মাকে পরম সত্যের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘হে পিতা! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনার কাছে করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এইভাবে আমরা দেখতে পাই একজন যথার্থ গুরুর প্রথম যোগ্যতা তিনি নিজে তাঁর গুরুর যথার্থ শিষ্য।

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ কৃষ্ণভক্তি বিতরণের জন্য পরিভ্রমণ করেন। নারদমুনিও সমগ্র সৃষ্টিতে এই একই উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী রয়েছে। একবার প্রজাপতি দক্ষের এগারো হাজার সন্তানকে নারদ মুনি ভগবৎ তত্ত্ব উপদেশ করেন। তাঁরা সেই সময় গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার জন্য তপস্যা করছিলেন। নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে তাঁরা সবাই গৃহস্থ হয়ে প্রজা সৃষ্টি করার

বাসনা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনে ব্রতী হন এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। প্রজাপতি দক্ষ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নারদ মুনিকে বলেছিলেন — ‘হে নারদ মুনি! আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং কোথাও আপনি স্থান পাবেন না।’ নারদ মুনি কৃতজ্ঞ চিত্তে এই অভিশাপটি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তাঁর মতো ব্রহ্মচারী প্রচারকের পক্ষে এটি ছিল আশীর্বাদ। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি, সপ্ত স্বর — সা, রে, গা, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মূলতঃ এগুলি এসেছে সামবেদ থেকে। নারদ মুনি এইগুলির মাধ্যমে ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন এবং ভগবান হৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করে সমস্ত গ্রহলোক পরিভ্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন —

‘নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে
নাম অমনি উদিত হয় ভক্ত গীত সামে।’

এখান থেকে শিক্ষণীয় এই যে, সর্বদা ভগবানের পাদপদ্মে চিত্ত নিয়োজিত রেখে প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করাই দীর্ঘ ও সফল ব্রহ্মচারী জীবনের রহস্য।

নারদ মুনির পূর্ব জীবনের কাহিনী

সাধারণতঃ গুরুর দেব তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কথা শিষ্যদের বলেন না। পক্ষান্তরে, গুরুর দেব সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্যদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করার জন্য গুরুর দেব তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কথা, তাঁর কৃষ্ণভক্তিতে আসার কথা ভাগ করে নেন। এই রকম দৃষ্টান্ত আমরা নারদ মুনির জীবনে দেখতে পাই। যখন নারদ মুনি ব্যাসদেবের আশ্রমে, ব্যাসদেবকে বিমর্ষ দেখেছিলেন সেই সময় ব্যাসদেবের সনির্বন্ধ প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি তাঁর পূর্ব জন্মের কথা ব্যাসদেবের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন।

নারদ মুনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক দাসীপুত্র। তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের একমাত্র পুত্র। মা ও পুত্র সন্তান ছাড়া তাঁদের সংসারে আর কেউ ছিল না। ছোট নারদ তাঁর মায়ের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর, তিনি মায়ের সঙ্গে, এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে বাস করতেন। বর্ণনা থেকে মনে হয় তাঁর মা গুরুকুলে আগত অতিথিদের সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। একবার চাতুর্মাস্যের সময় কয়েকজন ভক্তিবৈদান্ত (বেদান্তের অনুসারী মহান ভগবদ্ভক্ত) সেখানে এসেছিলেন। ছোট নারদ তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁদের সেবায়

নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন নারদ মহান ভক্তিবাদান্তদের অনুমতিক্রমে তাঁদের ভুক্তবশেষ গ্রহণ করেন। যার ফলে তাঁর সমস্ত পাপকর্ম তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং তাঁর হৃদয় পবিত্র হয়ে ওঠে। ভক্তিবাদান্তদের নির্মল স্বভাব তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি নিয়মিত তাঁদের থেকে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ ও নীলার কথা শুনতে থাকেন। ক্রমশই তিনি ভগবানের গুণকীর্তনে এক দিব্য স্নাদ লাভ করেন এবং তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। চাতুর্মাস্যের শেষে বিদায় নেবার সময় ভক্তিবাদান্তগণ অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে শিশু নারদকে পরমগুহ্য জ্ঞান উপদেশ করেন যা ভগবানের থেকে অপিত।

তারপর একদিন দুধ দোহন করতে যাবার সময় নারদের মা সর্পদংশনে প্রাণ ত্যাগ করেন।

শিশু নারদ যদিও সম্পূর্ণ রূপে মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাকে তিনি ভগবানের বিশেষ কৃপা রূপে গ্রহণ করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ভগবান কৃপাবশতঃ তাঁর শেষ জড় বন্ধনটি ছিন্ন করলেন। নারদ উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হন।

অনেক গ্রাম, শহর, বন, পর্বত, উপত্যকা অতিক্রম করে এসে, তিনি এক অশ্বখ বৃক্ষের নীচে পরমাত্মার ধ্যানে লিপ্ত



হন। তাঁর মন ভগবানের প্রতি দিব্য ভালবাসায় আবিষ্ট হয়। তাঁর কপাল দিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে এবং মুহূর্তের জন্য তিনি ভগবানের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই রূপ অন্তর্হিত হয় এবং নারদ মুনি পুনর্বার সেই রূপ দর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি ভগবানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পান — ‘হে নারদ! এই জীবনে তুমি, আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হতে পারেনি তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে। হে, নিষ্পাপ, তুমি কেবলমাত্র একবার আমার রূপ দর্শন করেছো এবং যা কেবলমাত্র আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। কেন না তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হবে।’ এরপর নারদ মুনি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম ও মহিমা কীর্তন করতে করতে নির্মলসর চিন্তে সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে থাকেন। অবশেষে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করবার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে তিনি তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করেন এবং পরবর্তী কল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে জন্মলাভ করেন।

নারদ মুনির পূর্বজন্মের কাহিনী আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। নারদ মুনির এক জন্মেই দাসীপুত্র থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং আমরা যে যত পতিত অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমরা ভক্তির পথ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে দ্রুত নির্মলতা লাভ করতে পারি। শুধু আমাদের শুদ্ধ ভক্তদের সেবা পরায়ণ হয়ে তাঁদের নিকট থেকে বিনীত ভাবে ভগবদ্বক্তৃ শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণের মাধ্যমেই নববিধা ভক্তির আরম্ভ। এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন—

‘তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার
বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার।
ভাগবতের কথা সে তব অবতার
ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার।’

দক্ষ প্রচারক

শ্রীমদ্ভাগবতের অনেকাংশই যেন নারদ মুনির প্রচারের কাহিনী আর তাঁর শিষ্যদের মহিমাতেই পরিপূর্ণ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যখনই কোন ব্যক্তিত্বের হৃদয় ভগবদ্ভক্তি গ্রহণের অনুকূল হয়েছে, ভগবানের দিব্য নির্দেশনায় নারদ মুনি ঠিক তখনই সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। কে নেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে — ছাত্র, গৃহস্থ, রাজা, দসু এমন কি সর্প। শুধু তাই নয়, আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন

সময় স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী নারদ মুনি তাঁর প্রচারের পদ্ধতিও পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু পরিশেষে প্রত্যেকেরই হৃদয় মন্থন করে কৃষ্ণপ্রেম নিষ্কাশিত করে তা ভগবানের চরণে অর্পণ করেছেন। প্রথম স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই, নারদ মুনি নিজের আত্মজীবনী বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাসদেবের হৃদয় আকর্ষণ করেন। চতুর্থ স্কন্ধে, নারদ মুনি ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ মন্ত্র দানপূর্বক ধ্রুব মহারাজকে দীক্ষা প্রদান করেন। আরও দেখতে পাই যে, নারদ মুনি রাজা প্রাচীন বর্হিষতকে পুরঞ্জনের উপাখ্যানের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেন এবং আরও পরে তাঁর পুত্র প্রচেতােদেরও উপদেশ প্রদান করেন। পঞ্চম স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই প্রিয়ব্রত মহারাজের গুরুও ছিলেন নারদ মুনি। ষষ্ঠ স্কন্ধে নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্ব ও সবলাশ্বদের হেয়ালিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং তাদের নিবৃত্তি মার্গে উৎসাহিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে অঙ্গিরা মুনির সঙ্গে নারদ মুনি চিত্রকেতু মহারাজকেও ভগবদ্ভক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেন। সপ্তম স্কন্ধে নারদ মুনি প্রহ্লাদ মহারাজকে মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। এছাড়া তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজকেও বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। দশম স্কন্ধে নারদ মুনি নলকুবের ও মনিগ্রীবকে শাপদানের মাধ্যমে তাঁদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পথটি সুপ্রশস্ত করেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন উৎস থেকে নারদ মুনির আরও প্রচারের কাহিনী জানা যায়। নরকের দৃশ্য দর্শন করানোর মাধ্যমে নারদ মুনি মৃগারিকে পশুহত্যা থেকে নিবৃত্ত করেন। দস্যু রত্নাকরকে ‘মরা’ নাম জপ করার উপদেশ করেন যিনি পরবর্তীকালে রামায়ণের প্রণেতা মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হন। এও জানা যায় এক সর্পও নারদ মুনির শিষ্য ছিল যাকে তিনি বলেছিলেন জীবহিংসা না করলেও আত্মরক্ষার জন্য কখনও কখনও ফোঁস করতে বারণ নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ (ভাগবত ৬। ৫। ৪৩) তাৎপর্যে লিখেছেন— ‘প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তবুও তিনি কোন এক স্থানে থাকতে পারবেন না। নারদ মুনির পরম্পরায় আমিও সেইভাবে অভিশপ্ত হয়েছি। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র রয়েছে এবং সেখানে থাকার খুব সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও আমি কোথাও থাকতে পারি না। আমার অল্পবয়সী শিষ্যদের পিতামাতারা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।’ পরে এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আরও যোগ করেছেন যে — ‘আমার যুবক শিষ্যেরা বিশেষ করে যারা

সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, তারা যদি পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তা হলে আমি শিষ্যদের পিতামাতাদের দেওয়া সেই অভিশাপ সেই সমস্ত যুবক প্রচারকদের উপর স্থানান্তরিত করতে পারি। তা হলে আমি একস্থানে স্বচ্ছন্দে বসে আমার অনুবাদের কাজ করতে পারি।’

নারদ মুনি - ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা পার্শ্ব

বিভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণনা ও গোস্বামীদের রচনা থেকে জানা যায় নারদ মুনি ভগবানের বিভিন্ন দিব্য ও অন্তরঙ্গ লীলাতে অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র জড় সৃষ্টির মধ্যেই নয়, চিদ্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় নারদ মুনি শ্রীবাস ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হন। মহাপ্রভু তাঁর সংকীর্ণের জন্য শ্রীবাস অঙ্গনকে মনোনয়ন করেছিলেন যা বৃন্দাবন লীলার রাসস্থলীর সঙ্গে তুলনীয়।

জগতের অনন্ত গ্রহলোকেও নারদ মুনির অবাধ গতি। ভগবান কৃষ্ণের দ্বারকা লীলার সময় নারদ মুনি তাঁর লীলা দর্শন করতে দ্বারকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কখনও কখনও নারদ মুনি ভগবদ্ ভক্তদের মধ্যে এক দিব্য দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করেন যা ভগবানের প্রীতিবর্ধন করে। যেমন একবার তিনি সত্যভামাকে গিয়ে বলেছিলেন যে, রুক্মিণীর কাছে পারিজাত ফুল আছে যা ইন্দ্রের নন্দনকানন থেকে এসেছে। যা শুনে সত্যভামা পারিজাত ফুল লাভ করতে খুব ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। গোস্বামীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় কখনও কখনও নারদ মুনি বৃন্দাবনের লীলাতেও অংশগ্রহণ করেছেন। নারদ মুনি অনেক সময় অনুঘটকের মতো কাজ করেছেন বা বিভিন্ন লীলায় সূত্রধরের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে নিয়ে যখন ব্রজবাসী ও দ্বারকাবাসীদের দিব্য কলহ হয়েছিল নারদ মুনি দ্বারকাবাসীদের পক্ষে উকিল রূপে উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের মতোই ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে নারদ মুনির লীলাও অনন্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় নারদ মুনি শ্রীবাস ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হন। মহাপ্রভু তাঁর সংকীর্ণের জন্য শ্রীবাস অঙ্গনকে মনোনয়ন করেছিলেন যা বৃন্দাবন লীলার রাসস্থলীর সঙ্গে তুলনীয়। মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে এতো ভালবাসতেন যে, শ্রীবাস ঠাকুরের মুসলমান দর্জিকেও তিনি কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। ❀

পুরীদাস দাস, ইসকন কোলকাতা ব্রহ্মচারী আশ্রমে নিয়মিত সেবা করেন।



এঁচড় বিরিয়ানী

উপকরণ : ভালো এঁচড় ১ কিলোগ্রাম। আলু ২টি বড় সাইজের। বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম। ঘি ৩০০ গ্রাম। লবন ও হলুদ পরিমাণ মতো। সাদা তেল ৫০ গ্রাম। চিনি পছন্দ অনুযায়ী। আদা ৫০ গ্রাম। খোয়া ক্ষীর ১০০ গ্রাম। জয়ত্রী জায়ফল ছোটএলাচ দারুচিনি লবঙ্গ সাহামরিচ, সাহাজিরা সব মিলিয়ে গুঁড়ো করা ১ টেবিল-চামচ। (জয়ত্রী, জায়ফল, ছোট এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সাহামরিচ, সাহা জিরা একসঙ্গে শুকনো কড়াইতে ভেজে গুঁড়ো করে নিলে এই গুঁড়োকে সাহি গরম মশলা বলে)। হিং ১চা-চামচ। লংকাবাটা পছন্দ মতো। কাজু ও চালমগজ বাটা ২ টেবিল চামচ। টক দই ১০০ গ্রাম। কেওড়া জল আধ কাপ। মিঠা আতর সামান্য। জাফরান ১ চিমটি। লংকাবাটা পছন্দ অনুযায়ী। দুধ আধকাপ।

প্রস্তুত পদ্ধতি : এঁচড় খোসা ছাড়িয়ে বড় বড় করে টুকরো করে নিন। আলুও খোসা ছাড়িয়ে বড় বড় টুকরো করে নিন। বাসমতী চাল ধুয়ে লবন দিয়ে সেদ্ধ করে ভাত করে নিন। আদা বেটে নিন। দুধের মধ্যে জাফরান ভিজিয়ে রাখুন।

এঁচড় ও আলু ভাপিয়ে নিন। এবার উনানে কড়াই বসান। ননস্টিক কড়াই হলেই ভালো। তাতে ৫০ গ্রাম সাদা তেল এবং কিছুটা ঘি দিয়ে লবন ও হলুদ দিয়ে এঁচড় ও আলু ভেজে নিন। ভাজা এঁচড় ও আলু একটা পাত্রে নামিয়ে রাখুন।

আবার কড়াইতে একটু ঘি দিন, চিনি ও হিং ফোড়ণ দিন। আদা বাটা, লংকা বাটা দিয়ে কষিয়ে তার মধ্যে কাজু ও মগজ বাটা দিয়ে নাড়িয়ে দিন। তারপর টক দই দিন। ভাজা এঁচড় ও ভাজা আলু দিয়ে কষে কষে শুকনো করে নামিয়ে নিন।

ননস্টিক কড়াইতে আবার একটু ঘি দিয়ে প্রথমে আলুর টুকরো অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে তার উপরে খানিকটা ভাত দিন। তার উপরে সাহি গরম মশলা কিছুটা ছড়িয়ে দিন। তার উপরে আবার কিছুটা ভাত দিয়ে এঁচড় দিয়ে আবার একটু সাহি গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। আবার বাকী ভাত, তার উপরে আলু এঁচড় সবটুকু দিন। বাকী মশলা, কেওড়ার জল, মিঠা আতর ও গ্রেট করা খোয়া ক্ষীর দিয়ে দিন।

হালকা আঁচে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখুন। তারপর আঁচ বন্ধ করে দিন। ঢাকনা খুলে দুধে ভেজানো জাফরান দিন। কড়াই ধরে ওলটপালট করে ভালোমতো মিশিয়ে নিন।

গরম গরম এই এঁচড় বিরিয়ানী শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন। 🌸

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

গীতাভূষণম্



শ্রীনিবাহী দাস

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারাংশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দার্শনিক শিক্ষা — যোদ্ধা অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের নির্দেশাবলী এই অধ্যায়ে আরম্ভ হয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন কৃষ্ণের কাছে নিজেকে শিষ্য রূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করেন, ‘এখন আমি কর্তব্যের প্রতি সংশয়াপন্ন এবং দুর্বল চিত্তের হেতু বিমর্ষ। এমতাবস্থায় কৃপা করে আমাকে বলুন আমার কর্তব্য কি? এখন আমি আপনার শিষ্য এবং আপনার প্রতি শরণাগত। কৃপা করে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন।’

অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে সখা রূপে আচরণ করছিলেন এবং সেইজন্যই কৃষ্ণ কোন নির্দেশ না দিয়ে শুধুই শ্রোতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগত হয়ে অর্জুন তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করার

পরই ভগবান যুদ্ধ সম্বন্ধে অর্জুনের সংশয়কে খন্ডন করতে শুরু করেন। জ্ঞান সর্বদাই উর্ধ্ব অবস্থান হতে নিম্ন অবস্থানে প্রবাহিত হয়। তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই একজন গুরু গ্রহণ করা উচিত। গুরু শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গভীর, এর অর্থ এই যে, মানব সমাজে সকলের মতামত একত্রিভূত অবস্থা অপেক্ষা আমাদের জীবনে গুরু নির্দেশ পরম গভীর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

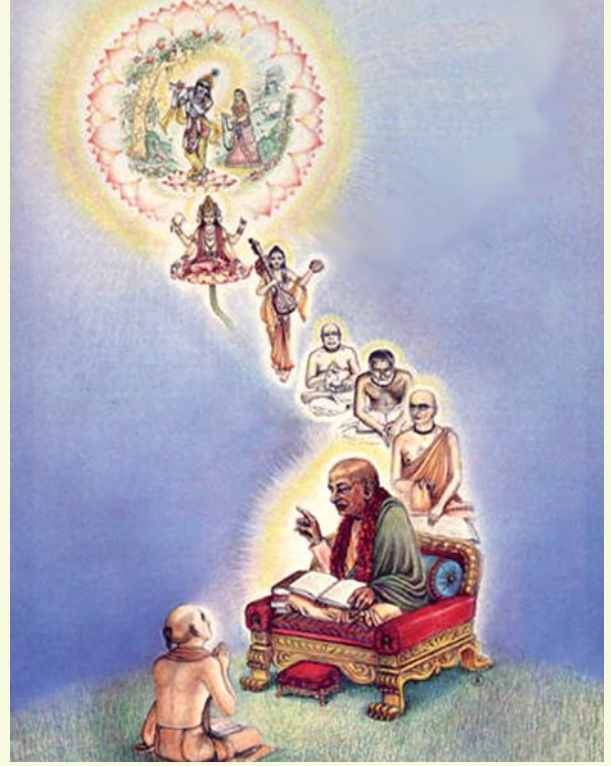
যখন ভগবদগীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ রয়েছে তাহলে আমাদের গুরু-শিক্ষকের কি প্রয়োজন?

গ্রন্থ রীতিনীতি সম্বন্ধে বলে কিন্তু স্থান, কাল, পরিস্থিতি (দেশ, কাল এবং পাত্র) অনুসারে আমাদের জীবনে কিভাবে সেই নীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে তা শুধু একজন গুরু বা শিক্ষকই আমাদের বলতে পারেন। গুরু শাস্ত্রের রীতি অনুসারে জীবন যাপন করেন এবং সেই সকল রীতি অনুসরণ করার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের বলেন। শাস্ত্র গ্রন্থের বাণী অনুসরণ করার নির্দেশাবলী তিনি আমাদের প্রদান করেন। আমাদের দুর্বলতাগুলিকে অতিক্রম করে সেগুলিকে আমাদের শক্তিতে পরিণত করতে সহায়তা করেন। প্রায়ই আমরা আধ্যাত্মিক রীতিনীতি বিস্মৃত হই এবং সেই সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্র আমাদের কোন সহায়তা করতে পারে না। কিন্তু একজন গুরুর নিকট আমরা ব্যবহারিক নির্দেশাবলী পাই এবং কখনো কখনো শাস্ত্রীয় রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিও তিনি নির্ধারণ করে দেন।



গুরু কে?

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।।



কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী অথবা শূদ্র যেই হয়ে থাকেন তিনি আধ্যাত্মিক গুরু হওয়ার উপযুক্ত। যেমন বিদ্যালয়গুলি সরকারী মান্যতা প্রাপ্ত কোনো বোর্ডের স্বীকৃতি পায়, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানী চারটি আধ্যাত্মিক বোর্ড অথবা সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পেলে তবেই গুরু হতে পারেন।

সম্প্রদায় বিনা এই মন্ত্র নিষ্ফলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারজন ব্যক্তিত্বকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন যাদের থেকে চারটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় —

ব্রহ্মা (কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করেন), রুদ্র (কৃষ্ণ শিবকে জ্ঞান প্রদান করেন), শ্রী (কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীকে জ্ঞান প্রদান করেন), কুমার (কৃষ্ণ চতুস্কুমারকে



জ্ঞান প্রদান করেন)। ইসকন ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভূক্ত। জ্ঞান গ্রহণের বৈদিক পদ্ধতিতে একটি নিয়ম বর্তমান — অধ্যয়ন করা এবং জ্ঞান অর্জন করা যাকে গুরু-সাধু শাস্ত্র বলা হয়। গুরু প্রদত্ত শিক্ষা আচার্যদেবদের (গুরু পরম্পরা অন্তর্ভুক্ত) প্রদত্ত শিক্ষার অনুসারী। পক্ষান্তরে যা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থগুলিকেই ব্যক্ত করে। এই হলো প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।

তাই শরণাগত অর্জুনের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কৃষ্ণ দেহ এবং আত্মার বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব (গীতা ২। ১১-৩০) সাংখ্যদর্শন উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা দান শুরু করেন। আত্মীয় নিধন সম্বন্ধে অর্জুনের ভয় উপশম করার জন্য, কৃষ্ণ আত্মার নিত্যতা (প্রকৃত সত্তা) এবং জড় জাগতিক দেহের (আত্মার বহির্ভাগ) অনিত্যতা বিশ্লেষণ করেন। আত্মা নিত্য, জড় জাগতিক দেহের বিনাশের পরেও আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মার কোন জন্ম বা মৃত্যু নেই। অবিনাশী, আত্মা জন্ম রহিত, নিত্য, সর্বদা বিরাজমান, অমর এবং অকৃত্রিম। তাই দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না (২। ২০)। মৃত্যুর পর আত্মা একটি নতুন দেহে গমন করে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে অনুরূপ ভাবে আত্মাও পুরাতন জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন জড়দেহ গ্রহণ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে নিত্য আত্মা জেনে কখনো

দেহের পরিবর্তনের কারণে বিচলিত হন না (মৃত্যু) এবং জড় দেহের অনিত্য সুখ এবং দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি জড় শরীর থেকে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য। যেহেতু প্রকৃত সত্তা হলো নিত্য এবং তার কখনো মৃত্যু হয় না, সেহেতু ক্ষত্রিয় সুলভ কর্তব্য পালন করার জন্য অনিত্য জড় দেহকে নিধন করতে অর্জুনের ক্রন্দন করাও উচিত নয়। এছাড়াও ক্ষত্রিয় রূপে তাঁর কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। 'একজন ক্ষত্রিয়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট কর্তব্য বিবেচনা করে তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য ধর্মীয় রীতিনীতির সপক্ষে যুদ্ধ করা অপেক্ষা উত্তম কার্য আর নেই এবং সেই জন্য কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।'

আত্মীয় নিধনের বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন করছেন, কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন, আত্মীয় কে, আমরা প্রকৃত পক্ষে আত্মা এবং আত্মা অমর। আর দেহ সর্বদাই মৃত। যদি অর্জুন তাদের নিধন না করার সিদ্ধান্ত নেন তবুও তাদের কোন না কোনভাবে মৃত্যু হবে। যে জন্মগ্রহণ করেছে তার অবশ্যই মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর পর তার পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং দেহের এই বাধ্যতামূলক মৃত্যুর জন্য নিজের কর্তব্য পালন করতে তোমার ক্রন্দন করা উচিত নয়।



১. আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের লাভ ঃ দিব্য গুণ প্রাপ্তি এবং আসুরিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি। আমার কর্মই আমার ভালো অথবা মন্দ ভবিষ্যত তৈরী করে। সমস্ত জীবাত্মাকে ভগবানের সন্তান রূপে ভালবাসতে শেখা উচিত। আমার নেতিবাচক

প্রবৃত্তিগুলি যেমন দম্ভ, মিথ্যাচারণ, আলস্য, দুরাচার ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করা উচিত আমার ভালোর জন্য এবং অপরের মনের শান্তির জন্য।

২. কান্না, ভ্রম এবং ভয় থেকে মুক্তি : ওহ! আমি অনেক অকৃতকার্য হয়েছি। আগামীবার ভালো করার জন্য আমার



অন্যের সাহায্য নিতে হবে। হয়তো আমাকে অরবিন্দের কাছে যেতে হবে। ও অনেক ভালো। আমাকে সাহায্য করতে পারে।

৩. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ : তোমার পূর্বপুরুষেরা (হিটলার) আমার পূর্বপুরুষদের (ইহুদি) হত্যা করেছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমি জানি যে, আমরা এই জড় দেহ নই, আত্মা, যেমন একটি গাড়ি থেকে তার চালক আলাদা।
৪. জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি : বন্ধু সাহায্য না করায় তাকে দোষারোপ না করে বরং আমাকে তাকে সাহায্য করতে শিখতে হবে এবং তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করতে হবে। তবেই আশা করা যায় তার পরিবর্তন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করবো ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের কাছে এই আচরণ আমি কিভাবে আশা করতে পারি।
৫. মন্ত্রজপের কৌশল এবং বিজ্ঞান : আমি দেহ নই, আমি বিশুদ্ধ আত্মা। ভগবানের সন্তান মূলত শুদ্ধ এবং অসীম গুণের অধিকারী। আমার হৃদয় প্রেম, আনন্দ, ধৈর্য এবং

অন্যের প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। আমি জপ করে আমার প্রকৃত চরিত্রকে প্রকাশিত করবো। আমার ক্রটিগুলি এই আত্মার আবরণ এবং আমি এগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারি।

৬. উৎসের প্রকৃত ব্যবহার : গাভীদের দিকে দেখ! তারা অনাহারে কষ্টে আছে। তাদের জন্য আমি কিছু তৃণের ব্যবস্থা করি। প্রতিটি জীবাত্মাই ভগবানের সন্তান এবং তাদের বাঁচার অধিকার আছে। যদি আমি আমার দেশের ধনী ব্যক্তিদের অবগত করাতে পারি যে, সমস্ত ধন সম্পদই ভগবানের এবং সেগুলি তাঁর সৃষ্ট জীবাত্মাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত — তাহলে আমাদের দেশে দারিদ্র থাকবে না।

অতঃপর কৃষ্ণ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করলেন। ভগবানের জন্য নিষ্কাম সেবা (কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে) করলে একজন জড় জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। অর্জুন অতঃপর কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই ব্যক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে — যিনি অনাসক্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী

এবং চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ বিশদভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যার ভগবৎ জ্ঞান দৃঢ় তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এইরূপ ব্যক্তি যিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী এবং দেহাত্মবোধ থেকে মুক্ত তিনি জড় জাগতিক সুখ সম্বন্ধে কোন আকর্ষণ অনুভব করেন না। এই রূপে তিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় এবং ভগবানের প্রতি স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ায় তিনি জড় জাগতিক দ্বৈতভাব যেমন সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হন না। এইরূপ ব্যক্তি জড় দেহের অবসানে ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হন।



সংকটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহ স্তোত্র



সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,
আরোগ্যভীকরমৃগপ্রসরাদিতস্য।
আর্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্।।

গভীর ঘন	সংসার বন	ভিতরে করি চারণ।
জন্তু ভীষণ	রোগ দংশন	করিছে সদা পীড়ণ।।
ঈর্ষা গরমে	জ্বলি মরমে	ব্যথাতে করি ক্রন্দন।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং,
সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্।।

অতল ঘোরে	কূপ সংসারে	নামিয়া করি রোদন।
শত সহস্র	যাতনা সর্প	অবিরল করে দংশন।।
দুঃখে নিতান্ত	হৃৎ হা হন্ত	তোমার কাছে প্রার্থন।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

শ্রীশঙ্করাচার্য

সংসারসাগরবিশালকরালকাল-
নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোমিনিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্।।

ভব সাগরে	কাল কুস্তীরে	করিছে সদা চারণ।
গ্রাস করিতে	উন্মুখ সদা	মহাকরাল বদন।।
ভীষণ রঙ্গে	লোভ তরঙ্গে	পড়িয়া করি ক্রন্দন।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

সংসারবৃক্ষমঘবীজমনস্তকর্ম,
শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্।।

শাখা সহস্র	অনন্ত কর্ম	পুষ্প যাহার মদন।
ইন্দ্রিয় পত্র	সংসার বৃক্ষ	অজস্র দুঃখ ফলন।।
তাহাতে চড়ি	পাতক ধরি	হইল অধঃ পতন।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

সংসারদাবদহনাতুরভীরোরুরুরু,
জ্বালাবলীভিরতিদক্ষতনরুহস্য।
তৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্।।

সংসার অগ্নি	মহাদাবাগ্নি	সর্বাস্তে বড় দহন।
তব চরণ	পদ্ম দিঘিতে	লইনু তাহে শরণ।।
উত্তাপহারী	শ্রীনরহরি	তোমারে করি বন্দন।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

যন্মায়য়োর্জিতবপুঃ প্রচুরপ্রবাহ-
মগ্নার্থমাত্র নিবহোরুকেরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাজমধুব্রতেন,
স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ।।

করণাধারী	হরি মুরারি	লঞা তোমার শরণ।
ভক্ত শঙ্কর	মঙ্গলকর	স্তোত্র করেন রচন।।
যাঁর মায়ার	প্রভাবে এই	ভৌতিক দেহ ধারণ।
করণা করো	লক্ষ্মী নৃসিংহ	আমি যে কৃপা ভাজন।।

অনুবাদ : সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী



তালবন

মধুবন থেকে তিন কিলোমিটার এবং মথুরা শহর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তালবন। এই বনের বর্তমান নাম তাড়সি। এখানে আগে প্রচুর তাল গাছ ছিল। খুব বড় বড় তাল। ভূমিতে পাকা তালগুলি পড়ে থাকত। সুমিষ্ট তালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু কেউই সেখানে তাল খেতে পারত না। এমন কি পশু-পাখিরাও নয়। কেননা ধেনুকাসুর নামে গর্দভ আকৃতির দুর্ধর্ষ অসুর সেখান সপরিবারে বাস করছিল। সেই সব তালগাছগুলি তার তত্ত্বাবধানে ছিল। অন্য কেউ তাল কুড়াতে গেলে তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। মথুরার রাজা কংসের সঙ্গে ধেনুকাসুরের বন্ধুত্ব ছিল। সে কংসের জন্য মাঝে মাঝে তালগুলো নিয়ে আসত।

একদিন কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে গাভী চারণের জন্য তালবনের দিকে এলেন। সখাগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে বলতে লাগল, অদূরে অসংখ্য তালগাছ রয়েছে। সেখানে ধেনুকাসুর থাকে। সে নরমাংসভোজী। তার ভয়ে কি মানুষ,

কি পশু, কি পাখি কেউই সেখানে যায় না। সেখানে পড়ে থাকা তালফলের গন্ধও আসছে। হে কৃষ্ণ, যদি মনে করো তবে সেই ফলগুলো এনে দাও। হে বলরাম, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তালবনে ঢুকতে পারো। কিন্তু মহাবলশালী দুর্ধর্ষ অসুরটা থেকে সাবধান।

এখানে সখারা তালফল খাওয়ার জন্যই যে লালায়িত তা নয়। তারা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ-বলরামের প্রভাব জানত।





তাই তারা বলতে চায় ধেনুকাসুরকে জন্ম করতে কৃষ্ণ-বলরাম পারবে কি না। অসুরটি যদিও গর্দভ আকৃতির, কিন্তু তার মাথায় বড় বড় সিং আছে, সে বিশাল বিশাল পাথরের পাহাড় তুলে নিয়ে অনেক দূরে ছুঁড়ে মারতে পারে। বলরাম তালবনে প্রবেশ করেই দুই হাতে তালগাছ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন। তার ফলে তাল ফলগুলি ধূপধাপ করে মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। সাধারণতঃ তালগাছকে ঝাঁকানো সম্ভব নয়। কিন্তু বলরাম সেরকম করতে লাগলেন। প্রচুর তাল পড়ার শব্দ শুনে ধেনুকাসুর দ্রুত ঘটনাস্থলে আসতে লাগল। অসুরটি যখন আসছিল তখন ভূমি কাঁপতে লাগল। এমনকি ব্রজের পর্বতগুলি টলমল হচ্ছিল।

ধেনুকাসুর এসেই প্রচণ্ড ক্রোধে কোনও কথা না বলে বলরামের বুক পেছনের দুটি পা দিয়ে অতি সজোরে আঘাত করে কর্কশ শব্দ করতে করতে এদিক ওদিক লাফাতে লাগল। পুনরায় পা দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলো। অন্য কেউ হলে এক আঘাতেই জীবন শেষ। কিন্তু বলরাম স্থির ছিলেন। তিনি এক হাতেই ধেনুকাসুরের পেছনের দুটি পা ধরে শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন। যেমন বালকেরা দড়িতে পাথর বেঁধে তাদের

মাথার উপরে বন্বন্ করে ঘোরাতে থাকে। অসুরটি প্রাণত্যাগ করলে বলরাম তাকে তালগাছের ঝাঁকড়া মাথার উপর নিক্ষেপ করলেন। অসুরের প্রচণ্ড ভারে তালগাছ দাঁড়াতে না পেরে পাশের তালগাছের উপর পড়ল। এভাবে একের পর এক পাশাপাশি তালগাছগুলি ভেঙ্গে যেতে লাগল। এ এক অদ্ভুত ঘটনা।

ধেনুকাসুরের অপঘাত মৃত্যু দেখে তার আত্মীয়-স্বজন ত্রুন্দ ও আক্রোশযুক্ত হয়ে বলরামের দিকে ধেয়ে এল। দলবল সবাইই ধেনুক বা গর্দভ আকৃতির। তারা কৃষ্ণ ও বলরামকে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু একে একে সবার পা ধরে ঘুরাতে ঘুরাতে কৃষ্ণ ও বলরাম দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছের মাথার উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল। এভাবে অসুর দল ধূপধাপ করে নিচে পড়ে মরল। তালগাছগুলোও একে একে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

সেদিন পুরো তালবন বড় বড় কালো কালো তালফলে কালো দেখাচ্ছিল। তারপরও ফাটা ফাটা তালফলের বাদামী রসে মাটি পিচ্ছিল হয়েছিল। তারপর তালগাছের ঝাঁকড়া মাথা অর্থাৎ প্রচুর সবুজ পাতায় ঢাকা পড়েছিল। তার উপর অসংখ্য অসুরদের রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। অসুরগুলোর যেমন ভারী ভারী বড় বড় পুষ্ট শরীর, তার



সাথে ভারী ভারী ধূসর রঙের বড় বড় তালগাছের গুঁড়ি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তালবনের প্রলয় দৃশ্য দেখা গেল।

সখারা কৃষ্ণ-বলরামকে আলিঙ্গন করতে লাগল। আকাশ থেকে দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন।

তাড়সি গ্রামের পশ্চিমভাগে পবিত্র তালবনকুণ্ড রয়েছে। তার তীরে বলরাম ও শিবের মন্দির আছে। বলা হয় তালবনে যে কোনও কুণ্ডে স্নান করলে দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হয়।

সেদিন গরু চরাতে গিয়ে তালবনে কত ঘটনা ঘটল। খবরাখবর জানতে পেরে কংস খুব ভয় পেল। বহুদিন ধরে ভয়ে যেখানে এই তালবনের দিকে মানুষ, পশুপাখি কেউ আসত না, ধেনুক বংশ নিপাতের পর সবাই স্বচ্ছন্দে এসব স্থানে যাতায়াত ও বিচরণ করতে লাগল।



ধেনুকাসুরের পূর্বজন্মের কথা গর্গসংহিতায় বলা হয়েছে। সে ছিল বলী মহারাজের পুত্র সাহসিক। বহু কামিনী সঙ্গে নিয়ে সাহসিক গন্ধমাদন পর্বতে খেলা করছিল। খেলা করতে গিয়ে হৈ হৈ চৈচামেচি আমোদ প্রমোদে সে মেতে ওঠে। সেই সময় পর্বতের গুহাতে মহর্ষি দুর্বাসা ধ্যানে বসেছিলেন। হৈ চৈ শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়। দুর্বাসা তখন সাহসিককে অভিশাপ দেন, হে দুমতি, তুই গর্দভ হয়ে ভূতলে অবস্থান কর। মূনির চরণে সাহসিক ক্ষমা চাইলে দুর্বাসা মূনি বলেছিলেন, দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরাম অবতীর্ণ হলে তাঁদের কৃপায় তোর মুক্তি হবে।

এই তাড়সি গ্রামের পশ্চিমভাগে পবিত্র তালবনকুণ্ড রয়েছে। তার তীরে বলরাম ও শিবের মন্দির আছে। বলা হয় তালবনে যে কোনও কুণ্ডে স্নান করলে দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হয়।

চুরাশি ক্রোশ ব্রজভূমিতে কোথাও তালগাছ দেখা যায় না। তালবনে বর্তমানে কোনও কোনও ভক্ত তাল রোপন করেছেন।

ধেনুকাসুর যতই ভারী দুর্ধর্ষ বলশালী ব্যক্তিত্ব হোক না কেন, শ্রীবলরামের কাছে অতি তুচ্ছ খেলনার মতো। অসুর মনে করেছিল এই তালবনের সে রাজা। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা যতদিন, ততদিন পর্যন্তই। তার একটু বেশি সময় রাজত্ব করার অধিকার কারোর নেই। ধেনুকাসুর মনে করেছিল সে লাথি মেরে সব প্রতিদ্বন্দীকে জন্ম করবে। কিন্তু সৃষ্টির কোনও জীবের পক্ষে এমন আত্মপর্থা সাজে না। অচিরেই সমস্ত দর্প চূর্ণ হয়। মানুষ, পশু, পাখি ধেনুকাসুরের ভয়ে আসত না। কিন্তু কারও ভয় ও উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকলে অকালে অপঘাতে মরতে হয়।

জগৎ সংসারের একটি নিয়ম আছে এই যে, আমার স্থিতিটি যেন অন্যের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কারণ না হয়। আমাদের জীবনে দোষ হয় যখন নিজের খেয়াল খুশি ও যথেষ্টচারিতায় চলি। সাহসিক রমণীদের সাথে আমোদ প্রমোদে, হৈ হুল্লোড়ে এত মেতে গেল যে, ধ্যানরত মূনি দুর্বাসার চরণে অপরাধ হলো। মূনি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে সাহসিক ক্ষমা চায়। এটি ভালো গুণ। আত্ম অহমিকাগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা পর্যন্ত চায় না। ক্ষমা চাওয়ার ফলে মূনিঋষিদের করুণার উদ্রেক হয়। মহর্ষি বললেন, ধেনুক রূপে থাকলেও শ্রীভগবান তাঁকে সালোক্য মুক্তি দেবেন। 🌸

